Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী সংস্কৃতি বনাম পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। কোনটা নিব,কেন নিব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মুনতাহা তুজ জাহওয়া

রোলঃ ২১৫০০১০৫৩

১০ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী সংস্কৃতি বনাম পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। কোনটা নিব,কেন নিব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মুনতাহা তুজ জাহওয়া

রোলঃ ২১৫০০১০৫৩

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামী সংস্কৃতি বনাম পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। কোনটা নিব,কেন নিব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মুনতাহা তুজ জাহওয়া, আইডিঃ ২১৫০০১০৫৩ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামী সংস্কৃতি বনাম পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। কোনটা নিব,কেন নিব ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Muntaha

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

মুনতাহা তুজ জাহওয়া

আইডিঃ ২১৫০০১০৫৩

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	৬
সংস্কৃতি কি?	৮
সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান	৯
সংস্কৃতি ও ইসলাম	৯
ইসলামী সংস্কৃতি কি?	১০
ইসলামী সংস্কৃতির মৌল বৈশিষ্ট্য	১২
ইসলামী সংস্কৃতির গোড়ার কথা	১৩
ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর	১৪
ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য	১৫
সংস্কৃতির ভিত রচনায় ঈমানের স্থান	২৩
ইসলামী সংস্কৃতিতে ঈমানের গুরুত্ব	২৪
ইসলামী সংস্কৃতির কাঠামো	২৭
ইসলামী সংস্কৃতিতে ঈমানের গুরুত্ব	৩১
মুনাফেকীর ভয়	৩৩
চিত্তবিনোদন ও ইসলামী সংস্কৃতি	৩৫
সিনেমা, টেলিভিশন ও নাট্যাভিনয়	৩৮
ছবি অঙ্কন ও প্রতিকৃতি নির্মাণ	৩৯
তাস, দাবাখেলা ও জুয়া	৪০
নাচ-গান ও বাদ্য-যন্ত্র	৪১
মদ্যপান	৪৩
পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে সংস্কৃতি	৪৪
সংস্কৃতির মূল্যায়ন	৪৪
সংস্কৃতির পাশ্চাত্য মূল্যায়ন	৪৭
পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক প্রভাব	৪৮
ফ্যাশন শো সংস্কৃতি	৪৯
বিজ্ঞাপন সংস্কৃতি	৪৯

ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা	৫০
সংস্কৃতি ও নৈতিকতা	৫৮
চরিত্র ও ঈমান	৬০
চরিত্র ও আল্লাহর ভালোবাসা	৬৩
আল্লাহর গুণাবলী ও চরিত্র	৬৪
চরিত্র ও ইবাদাত	৬৪
আল্লাহর হক্ক ও বান্দাহর হক্ক	৬৬
নৈতিক চরিত্র ও আইন	৬৭
উপসংহার	৬৯
তথ্যসূত্র	৭১

ভূমিকা

পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম একটি বর্বর সভ্যতা ছিল আরব জাতির সভ্যতা। তাদের সংস্কৃতির বিষয় বস্তু ছিল প্রেম-ভালোবাসা, যিনা-ব্যভিচার, মদ খাওয়া অথবা জুয়া খেলার মত সমাজ বহির্ভূত, নিকৃষ্ট বিষয়সমূহ। যা হোমারের ইলিয়ড, এবং সফোক্লিসের অডেসির কাহিনীর চেয়েও আরো ভয়ঙ্কর। তারা পৃথিবীর ইতিহাসে নিকৃষ্টতম কাজগুলো করে বেড়াতো। সমাজের মধ্যে সংস্কৃতির নামে যুদ্ধ, রাহাজানি, অত্যাচার, নিপীড়ন, কন্যাসন্তানদেরকে জীবন্ত কবরদান, গোত্রে গোত্রে বিরোধ, ইত্যাদি করে বেড়াতো। আর এমনি পরিস্থিতে আরবের বুকে আবির্ভূত হলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন, বিশ্ব মানবতার মুক্তির বাহক হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। আর তিনি সে সময়ে আরব জাতিকে উপহার দিয়েছেন এমন এক সংস্কৃতি ও সভ্যতা যা দ্বীন ও দুনিয়ার এক মহত্বের সমন্বয়ে ঘঠিত, যে সংস্কৃতির প্রতিটি দিক মানুষের কল্যান ও উন্নতি-অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ সংস্কৃতির রয়েছে কিছু অসাধারন বৈশিষ্ট্য, যার ভিত্তি হচ্ছে তাওহিদ, রেসালাত ও আখিরাত উপর বিশ্বাস। মুসলিম সংস্কৃতি যখন মানুষকে আশার আলো দেখাতে শুরু করলো, সমাজের মধ্যে মানুষ হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে এক কাতারে দাঁড়াতে শুরু করলো, সমাজ ও মুসলিম দেশ গুলো হয়ে গেল রক্ত পাতহীন, আদর্শের অনুসারী, কোলাহোল মুক্ত, সবার মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হলো, তখনি মুসলিম বিদ্বেষী তথা পাশ্চাত্যবাদীরা ইসলামী সংস্কৃতির উনুপম দৃষ্টান্ত সমূহ সহ্য করতে না পেরে এর বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র শুরু করলো। ষড়যন্ত্রকারীরা ইসলামী সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করতে নানা ফাঁদ বুনতে শুরু করলো। পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্রকারীরা এ ব্যাপারে সরাসরি আঘাত না করে এর ভিত্তি উপড়ানো যাবে না বলে বুদ্ধিমত্তার সাথে দরদী বন্ধু বেশে সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতেছে মুসলিম জাতির সামনে। মুসলিম দেশগুলোতে পাশ্চাত্য দেশগুলোর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন দিন দিন শুধু বেড়েই চলেছে।

ইসমাহ বিন কায়স রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাচ্যের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাইতেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, পশ্চিমের ফেতনা

কেমন হবে? তিনি বললেন, এটা হবে আরো অধিক ভয়ংকর। - মুজামেহ তাবারানী, হাদীস নং ৫০১; হাইসামী রহ. বলেন, বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

উল্লিখিত পশ্চিমের হাদিসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাশ্চাত্যের ভয়াবহ যেই ফিতনার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, সম্ভবত বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতা সেই ফিতনা। তবে আল্লামা ইউসুফ বানুরী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসে উল্লিখিত পশ্চিমের ফিতনা বলতে 'মুসতাশরিকদের' (প্রাচ্যবিদ বা Orientalist) ফিতনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কারণ এটি একটি পশ্চিমা ইলমি ফিতনা, যার প্রভাবে পৃথিবী আজ ইরতিদাদ ও ইলহাদে সয়লাব হয়ে গেছে।

ইলহাদ হলো জরুরিয়াতে দ্বীনের স্বতঃসিদ্ধ ব্যাখ্যাকে পরিবর্তন করে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা করে কুফরের দিকে নিয়ে যাওয়ার বা কোনো কুফরকে ইসলামিকরণের অপ্রচেষ্টা। (ইকফারুল মুলহিদিন)

সংস্কৃতি কি?

সংস্কৃতি হলো তাহযীব, তুমুদ্দন বা ইংরেজী কালচারের প্রতিশব্দ। “সংস্কৃতি” শব্দটি সংস্করণ বা সংস্কার শব্দে থেকে এসেছে। ‘সংস্করণ’ অর্থ বিশোধন, সংশোধন। ‘সংস্কার’ অর্থ শুদ্ধিকরণ, শাস্ত্রীয় নীতিমালা ও অনুষ্ঠানাদি দ্বারা পবিত্রকরণ, শোধনকরণ বা পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধারকরণ, পরিষ্কার বা নির্মলকরণ, অলংকরণ, প্রসাধন, উৎকর্ষ সাধন, উন্নতি বিধান, মেরামতকরণ। অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি, রীতিনীতি ও মার্জিত আচার-আচরণ ইত্যাদির উৎকর্ষ হচ্ছে কৃষ্টি বা Culture এর বিশেষণ। ‘সংস্কৃত’ শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন বস্তু বা বিষয় যা সংস্কার করা হয়েছে, সজ্জিত ও অলংকৃত করা হয়েছে। কৃষ্টিও সংস্কৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অনেকে মনে করে সংস্কৃতি বলতে একটি জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প-কারিগরী, ললিতকলা, সামাজিক রীতিনীতি, জীবন প্রণালী, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলোই সংস্কৃতির প্রকৃত মূল নয়, কেবল তার ফলাফল ও বহিঃপ্রকাশ। সংস্কৃতি গাছের মূল এবং কাণ্ড নয়, কেবল তার শাখা-প্রশাখা ও তার পত্র-পল্লব মাত্র। এই বাহ্যিক লক্ষণ ও খোলসের ভিত্তিতে কোনো সংস্কৃতির মূল্যমান নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং, আমাদের সংস্কৃতির মূলে যেতে হবে, এর মূল ভিত্তি এবং মৌলিক উপাদানগুলি আমাদের বোঝা প্রয়োজন। বস্তুত, সামগ্রিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক শক্তির শুভ সমন্বয়ের আরেকটি নাম ‘সংস্কৃতি’।

আরবী ‘সাকাফাহ্’ অর্থ- সফল হওয়া, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পাওয়া। শিক্ষার মাধ্যমেই সফলতা আসে। কোন ব্যক্তি-মানুষের বাহ্যিক আচরণ ও কর্মানুষ্ঠান যখন অন্যের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়, ঐ মানুষটিকে তখন আরবী সমাজে বলা হয় (মুসাক্কাক) অর্থাৎ সংস্কৃতিবান, শিক্ষিত।

উর্দু ‘তমদ্দুন’ শব্দটি ‘মদীনা’, ‘মুদান’ বা ‘নগর’, ‘শহর’ থেকে গঠিত। নগরজীবন ও শহরজীবনের ধারা ও চিন্তা-চেতনা যেহেতু গ্রামীণ জীবনধারা ও চিন্তা-চেতনার তুলনায়

অনেক দিক থেকে পরিশীলিত ও মার্জিত হয়ে থাকে, তাই নগর-সভ্যতা, নগর-কৃষ্টি ও আচার-আচরণ আশ্রিত জীবনাচারকে তমদ্দুন কিংবা তাহযীব-তমদ্দুন বলা হয়।

তাহযীব শব্দের অর্থ হচ্ছে সজ্জিতকরণ। যে ব্যক্তি বা সমষ্টি আপন চিন্তা চেতনা ও জীবনধারার মধ্য দিয়ে নিজেকে সজ্জিত, নন্দিত, পরিশীলিত ও সমাদৃত করে উপস্থাপন করতে পারে তাকে বলা হয় সংস্কৃতিবান ও সভ্য।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব । তার এই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা বজায় রাখা ও এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে তার প্রয়োজন সংস্কৃতির যা মানুষের আছে, অন্য জীবের কোনো সংস্কৃতি নেই। মানুষ হিসেবে মানুষের আসল পরিচয়ই তার সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান

সংস্কৃতি পাঁচটি মৌলিক উপাদান নিয়ে গঠিত। যথা:

(১) পার্থিব জীবনের ধারণা,

(২) জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য,

(৩) বুনিয়াদি আকীদাও চিন্তাধারা

(৪) ব্যক্তি প্রশিক্ষণ এবং

(৫) সামাজিক ব্যবস্থা।

পৃথিবীর প্রতিটি সংস্কৃতিই এই পাঁচটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। বলা বাহুল্য, ইসলামী সংস্কৃতিও এই উপাদানগুলির সাহায্যে তৈরি হয়েছিল।

সংস্কৃতি ও ইসলাম

এই পৃথিবীর সকল জনগোষ্ঠীর সকল মৌল সত্যের সমষ্টি হলো ইসলাম। তার সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন, সর্বজনীন ও সুদুরপ্রসারী। দুনিয়ার অন্য যেসব সংস্কৃতি বা

সাংস্কৃতিক উপাদান তার মৌল ভাবধারার অনুকূল, তা সবই ইসলামে রয়েছে। বস্তুত যে সংস্কৃতিতে ইসলাম-বিরোধী উপাদান ও উপকরণ রয়েছে, তা-ই সুস্পষ্টভাবে মানবতা বিরোধী; তার সাথে ইসলামের রয়েছে চিরন্তন সংঘর্ষ। ইসলামী সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ দান কোন সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের সংরক্ষণ নয়। তাতে বরং সমগ্র কল্যাণকর সংস্কৃতিই সংরক্ষিত হয় এবং তাতে করেই সমস্ত তামাদ্দুনিক সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি সম্ভব হতে পারে।

ইসলামী সংস্কৃতি গ্রীক বা পারসিক সংস্কৃতি নয়। তাই গ্রীক বা পারসিক সংস্কৃতিকে ইসলামী সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দেয়া যাবে না। ইসলামী সংস্কৃতি ইসলামী মতাদর্শের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠেছে। আল্লাহর কালাম কুরআন মজীদেই এ মতাদর্শের বিস্তারিত রূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেছে এবং নবী করীম (স)-এর মহান জীবন ও শিক্ষায় তারই সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়েছে।

ইসলামী সংস্কৃতি কি?

বলে রাখা দরকার যে, দুনিয়ার প্রখ্যাত কয়েকজন মনীষী 'ইসলামী সংস্কৃতি' নামক কোনো সংস্কৃতি মানতে নারাজ। অনেকে গ্রীক, রোমান, প্রাচীন মিশরীয়, পারসিক বা ভারতীয় সংস্কৃতিকেই ইসলামী সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহেরু তাঁর আত্মচরিতে 'ইসলামী সংস্কৃতি' কথাটির ওপর এবং উপমহাদেশীয় মুসলিম সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন। তিনি বলেছেন: 'মুসলিম সংস্কৃতি'কে বুঝতে আমি যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। শেষ পর্যন্ত আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, উত্তর ভারতের মধ্যম শ্রেণীর মুসলমান ও হিন্দু ফারসী ভাষা ও কিংবদন্তীতে খুবই প্রভাবিত হয়েছিল। তাদের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে জানতে পারা যায় যে, এক বিশেষ ধরনের পাজামা-না লম্বা না খাটো-বিশেষ ধরনে গোঁফ মুণ্ডন করা, দাড়ি রাখা এবং এক বিশেষ ধরনের লোটা-যার বিশেষ ধরনের থুখনি হবে, এগুলোই

হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতি'। মুসলিম সংস্কৃতি তথা ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে মিঃ নেহেরুর এ উক্তি খুবই হাস্যকর!

ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদরাও (Orientalists) মিঃ নেহেরুর মতো। জার্মান পণ্ডিত ভন ক্রেমার ও লেবাননী পণ্ডিত ফিলিপ হিষ্টিও ইসলামী সংস্কৃতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। তাদের মতে মুসলমানরা যখন পারস্য ও মিশর জয় করে, তখন তারা প্রাচীন সভ্যতার ধারক লোকদের সম্মুখীন হয় এবং তারা সবকিছু এদের কাছ থেকে শিখে নেয়। আরো বলা হয়, আরব মুসলমানদের নিজস্ব সংস্কৃতি বলতে কিছুই ছিলনা। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, স্থাপত্যবিদ্যা, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাজ্য-শাসন এ সবের কিছুই জানতনা মুসলমানরা। তবে এসব কিছু জানবার ও শেখবার বড় অসাধারণ যোগ্যতা ও প্রতিভা মুসলমানদের মাঝে ছিল। এ পর্যায়ে প্রাচ্যবিদরা বলেন: গ্রীক, পারসিক ও আর্মেনিয়ান শিল্পকলা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পুনর্জীবন দান করেন প্রথমে আরব মুসলমানরা এবং পরে দুনিয়ায় বিভিন্ন জায়গার মুসলমানরা।

ইসলামী সংস্কৃতিকে অস্বীকার করেছেন এ যুগের এবং এ দেশের প্রতিবেশী অমুসলিম জাতিও। শুধু তা-ই নয়, তাদের ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত ও ইউরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞানে পারদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তিরা এবং তথাকথিত মুসলিম নামধারী লেখকরাও ইসলামী সংস্কৃতিকে-সংস্কৃতির ইসলামী ধ্যান-ধারণাকে তথা ইসলামী রূপরেখাকে বুঝতে পারেন নি; হয়ত-বা বুঝতে চেষ্টাই করেননি অথবা বুঝতে চাননি কিংবা বলা যায় বুঝতে পেরেও তাকে অস্বীকারই করতে চেয়েছেন। কেননা ইসলামি সংস্কৃতিতে বর্তমানের আবর্জনা, অশ্লীলতা ও জঘন্যতার কোনো জায়গা নেই আর এসব পরিহার করলে জীবনের আনন্দ-স্ফূর্তির উৎসই যে বন্ধ হয়ে যাবে-মৌচাক যাবে শুকিয়ে। তখন জীবন যে যাবে মরু আরবের মত ঊষর-ধূসর-রুক্ষ-নিরস হয়ে। তখন বেঁচে থাকার স্বাদটুকুও যে নিঃশেষ হয়ে যাবে; ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, ইসলামি জীবনযাপন করলে জীবনের গতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে, যা তাদের পক্ষে সহ্য করা কিছুতেই সম্ভব হবেনা। অতএব তাদের বলতে হয়েছে:

‘স্থূলভাবে যারা ধর্মাচরণ এবং ধর্মভিত্তিক ধ্যান-ধারণার সমষ্টিকে সংস্কৃতি বা তামাদ্দুন মনে করেন অথবা আরব-পারস্যের জ্ঞান-চর্চা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকেই যারা মুসলিম জাহানের সংস্কৃতি বলতে চান, তাদের সঙ্গে তর্ক দুঃসাধ্য। (দৈনিক সংবাদ)

দুনিয়ার মনীষীদের মত অনুযায়ী ‘ধর্মকে সংস্কৃতির উৎস’ রূপে স্বীকার করে নিলে ধর্মকে মানতে হয়, মেনে নিতে হয় ধর্মীয় অনুশাসন, সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হয় বর্তমানে সংস্কৃতির নামে চলমান অনেক অশ্লীলতা, জঘন্যতা ও বীভৎসতার আবর্জনাকে।

ইসলামী সংস্কৃতির মৌল বৈশিষ্ট্য

(১) তওহীদ (২) মানবতার সম্মান (৩) বিশ্ব-ব্যাপকতা, সর্বজনীনতা (universality), ভৌগলিক অভিন্নতা (৪) মানবীয় ভ্রাতৃত্ব (৫) বিশ্বশান্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ (৬) বিশ্ব-মানবের ঐক্য (৭) কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ (৮) পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা এবং পংকিলতা থেকে মুক্তি (৯) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা (১০) ভারসাম্য, সুষমতা ও সামঞ্জস্য।

এসব মৌল উপাদান ও ভাবধারাকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তা-ই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি। যে সংস্কৃতিতে এর কোন একটি উপাদান ও ভাবধারার অভাব থাকবে, তা আর যাই হোক ইসলামী সংস্কৃতি হবেনা এবং তা হতে পারেনা ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসীদের গ্রহণযোগ্য সংস্কৃতি।

বর্তমান মুসলিম সমাজে এর বিপরীত আদর্শের উপাদান ও ভাবধারায় গড়া সংস্কৃতি বিরাজমান। বিদেশী ও বিজাতীয় ভাবধারার প্রভাবে মুসলিম সংস্কৃতি আজ পংকিলতাময়। আজ আমাদের সংস্কৃতিকে বিদেশী ও বিজাতীয় উপাদান ও ভাবধারা থেকে মুক্ত করে ইসলামী আদর্শের মানে উত্তীর্ণ এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইসলামী আদর্শবাদীদের সংগ্রাম চালাতে হবে। এ সংগ্রাম কঠিন, ক্লান্তিকর ও দুঃসাধ্য। এ পথে পদে পদে নানাবিধ বাধা-বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা ও অসুবিধার সম্মুখীন

হতে হবে। কিন্তু পরিপূর্ণ নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে এ সংগ্রাম চালাতে পারলে এর জয় সুনিশ্চিত। বর্তমান বিশ্ব এমনি ভারসাম্যপূর্ণ, মানবতাবাদী ও সর্ব মানুষের জন্যে কল্যাণকর এক সংস্কৃতির প্রতীক্ষায় উদগ্রীব। কল্যানকর ও মঙ্গলময়। এ বিষয়টি বাস্তবভাবে বুঝার জন্য পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্যটা অবশ্যই আমাদের জানা থাকা জরুরি।

ইসলামী সংস্কৃতির গোড়ার কথা

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা আর এ জীবন ব্যবস্থার চিন্তামূলক দিকই হল ইসলামী সংস্কৃতি। তাই ইসলামী সংস্কৃতি বলতে নিম্নোক্ত তিনটি জিনিস বুঝায়:

১. উন্নততর চিন্তার মান, যা ইসলামী রাষ্ট্রের কোন এক যুগে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

২. ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান এবং শিল্পের ক্ষেত্রে ইসলামের অর্জিত সাফল্য।

৩. মুসলমানদের জীবনধারা, ধর্মীয় কাজকর্ম, ভাষার ব্যবহার ও সামাজিক নিয়ম-প্রথার বিশেষ সংযোজন।

সংস্কৃতি হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের মানসিক অবস্থা, যা ইসলামের মৌল শিক্ষার প্রভাবে গড়ে ওঠে; যেমন আল্লাহর একত্ব, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মানব বংশের ঐক্য ও সাম্য সংক্রান্ত বিশ্বাস।

আসলে ইসলামী সংস্কৃতি আলোর এক সুউচ্চ মীনার; এ থেকেই ইসলামী সভ্যতা রূপায়িত হয়। এ মীনারই সমগ্র জগতের সংস্কৃতিসমূহকে প্রভাবান্বিত করেছে, আপন করে নিয়েছে।

ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর

এক কিতাব ও এক রসূলের প্রতি ঈমান, তারই আনুগত্য-অনুসরণ, তারই গড়া ছাঁচে মানসিকতার পুনর্গঠন, সেই এক উৎস থেকে গোটা আকীদা, ইবাদাত, নৈতিকতা, লেনদেন ও সামাজিক বিধানের উৎসারণ এবং সেই ঈমান, আনুগত্য ও অনুসরণের সূত্রে গোটা মুসলিম সমাজের সংযুক্তিকরণই ইসলামকে একটি স্থায়ী সংস্কৃতি এবং সকল প্রকার বংশগত, ভাষাগত, বর্ণগত ও ভৌগলিক পার্থক্য সত্ত্বেও মুসলমানদেরকে একটি জাতিতে, এক উম্মতে পরিণত করেছে। অবশ্য জ্ঞান- বুদ্ধি, অন্বেষণ, অনুসন্ধান, দৃষ্টিভংঙ্গি ও ঝোঁক প্রবণতার পার্থক্যের ফলে কুরআনের আয়াত ও রসূলের সুন্নাত থেকে আইন প্রণয়নে এবং তাদের মর্ম ও লক্ষ্য অনুধাবনে পার্থক্য সূচিত হতে পারে। কিন্তু এ পার্থক্য হচ্ছে নেহাতই খুঁটিনাটি ও ছোটখাট বিষয়ের; এটা ফিকাহ ও কালামশাস্ত্রের বিভিন্ন মাযহাবকে আলাদা-আলাদা দ্বীন এবং তাদের অনুসারীদেরকে পৃথক পৃথক জাতিতে পরিণত করে না। ইসলামী মিল্লাতের আসল ভিত্তিমূল হচ্ছে আল্লাহর রসূল হিসেবে মুহাম্মদ (সা)-কে একমাত্র অনুসরণীয় রূপে বরণ করা এবং আল্লাহর কিতাব হিসেবে কুরআন মাজীদকে একমাত্র আইন গ্রন্থ রূপে স্বীকার করা আর দু'টি জিনিসকেই গোটা আকীদা-বিশ্বাস ও আইনের উৎস বলে ঘোষণা করা। এ মৌলিক বিষয়ে যারা একমত, খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাদের মধ্যে যতই মতানৈক্য থাকুক, তারা সবাই মিলে এক জাতি। আর এ মৌলিক বিষয়ে যারা একমত নয়, তারা পরস্পরে যতো জাতিতেই বিভক্ত হোক, কুরআনের দৃষ্টিতে তারা একটি ভিন্ন জাতি।

বস্তুত যেসব বিষয়ের ওপর ইসলামের ভিত্তি নির্ভরশীল, কুরআন হচ্ছে তার পূর্ণাঙ্গ সংকলন। যে ব্যক্তি কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছে, সে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর নবী এবং পরকালের প্রতিও ঈমান এনেছে। কারণ এ গোটা ঈমানিয়াতের বিস্তৃত বিবরণ কুরআনেই বর্তমান রয়েছে। আর 'ঈমান বিল কুরআনের' (কুরআনের প্রতি ঈমান) নিশ্চিত সুফল হলো মানুষের পরিপূর্ণ ঈমান লাভ। এভাবে কুরআন মাজীদে ইসলামী শরীয়তের সকল মূলনীতি ও মৌল বিধানও উল্লেখিত রয়েছে এবং সেসব নীতি ও বিধানকে শরীয়ত প্রণেতা নিজের কথা ও কাজ দ্বারা সুস্পষ্ট করে দিয়ে

গেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি নির্ভুল ঈমানের সাথে কুরআন ও সুন্নাতে রসূলকে জীবনের যাবতীয় বিষয়াদিতে অবশ্য পালনীয় আইন বলে ঘোষণা করে, সে নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস ও কর্মের দিক দিয়ে মুসলমান। আর এমন ঈমান ও আইন পালনের সমষ্টিকেই বলা হয় ইসলাম। যেখানে এ দু'টি জিনিস বর্তমান থাকবে সেখানে ইসলামও থাকবে। আর যেখানে এ দু'টি থাকবে না, সেখানে ইসলামও থাকবে না।

ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য

আল্লাহ তায়ালা বলেন: "হে নবী, তুমি বলে দাও আমার নামায, আমার ইবাদাত, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবকিছুই সেই আল্লাহর জন্যে যিনি সমস্ত জাহানের প্রভু এবং যার কোনই শরীক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেয়া হয়েছে এবং আমিই তাঁর সামনে সর্বপ্রথম মস্তক অবনতকারী-আত্মসমর্পণকারী।"-- (সূরা আল আন'আম : **১৬২-১৬৩**)

"আল্লাহ মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, হত্যা করে এবং নিহিত হয়।

সুতরাং (আল্লাহর সাথে) তোমরা যে বেচা-কেনা করেছো, তার জন্যে আনন্দ করো, প্রকৃতপক্ষে এটাই বড়ো সাফল্য।" *–(সূরা আত তাওবা: ১১১)*

হাদীসে বর্ণিত আছে:

"আল্লাহ কেবল সেই আমলকেই কবুল করেন, যা খালেছভাবে তাঁরই জন্যে করা হবে এবং যা দ্বারা শুধু তাঁর সন্তুষ্টিলাভই লক্ষ্য হবে।"

এ আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইসলাম সর্বপ্রকার পার্থিব ও পরকালীন স্বার্থ পরিত্যাগ করে একটি মাত্র বস্তুকে জীবনের লক্ষ্য, মানুষের সকল প্রয়াস-প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য এবং সমগ্র ইচ্ছা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবস্তু বলে ঘোষণা করেছে আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন। এ লক্ষ্যের যে সব বৈশিষ্ট্য বিশেষত্ব একে সর্বোত্তম জীবন লক্ষ্যে পরিণত করেছে, তা হলো:

• <u>এক</u>: স্বাভাবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক লক্ষ্যের সামঞ্জস্য – বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে ইসলাম যে মতবাদ পেশ করে, প্রকৃতপক্ষে তা মতবাদের সীমা অতিক্রম করে ঈমান ও প্রত্যয়ের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে। সে মতবাদটি হচ্ছে এই যে, সৃষ্টির এই অন্তহীন রাজ্যের মালিক ও শাসক হচ্ছেন এক আল্লাহ। সমগ্র সৃষ্টিজগত তাঁরই অধীন ও অনুগত এবং তাঁরই সামনে আত্মসমর্পিত।

এরই নাম হচ্ছে ইসলাম, এর অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণ। গোটা বিশ্বপ্রকৃতি এবং তার প্রতিটি অণু-পরমাণু ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়- এই দ্বীন ইসলামেরই অনুবর্তী।

সমগ্র সৃষ্টিজগতের এমন কি মানুষেরও স্বাভাবিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য হলো মহাশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা। তাই প্রত্যেকেরই স্বাভাবিক গতি সেই কেন্দ্রস্থলের দিকেই নিবদ্ধ। এক্ষণে এক যুক্তিবাদী সৃষ্টি হিসেবে মানুষ এই স্বাভাবিক লক্ষ্য সম্পর্কে চেতনা লাভ করবে এবং বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির সাহায্যে তাকে অনুধাবন করে নিজের ইচ্ছা-প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার গতিকে তারই দিকে ফিরিয়ে দিবে-এটুকুই হচ্ছে তার কাজ। তার ও সমগ্র সৃষ্টির স্বাভাবিক লক্ষ্যের সাথে তার বুদ্ধিগত লক্ষ্য সামঞ্জস্যশীল হয়ে যাবে। বিশ্বজাহানের সকল সৈন্য-সামন্ত এবং সৃষ্টি ব্যবস্থার প্রতিটি অণু -পরমাণু এই লক্ষ্যে উপনীত হবার ব্যাপারে তার সহায়তা করবে এবং সে বুদ্ধিগত মর্যাদার কারণে এই বিরাট কাফেলার নেতা হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে এ লক্ষ্যবস্তুকে ছেড়ে সে যদি অন্য কোন বস্তুকে বুদ্ধিগত লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে, তবে তার দৃষ্টান্ত হবে এমন এক ব্যক্তির মতো যে কোন একটি কাফেলার সঙ্গে রয়েছে। কাফেলাটি পশ্চিম দিকে চলছে। ঐ লোকটি যে ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়েছে, সেও পশ্চিম দিকেই ছুটছে। কিন্তু কাফেলা বা সওয়ারী ঘোড়ার গতি কোন দিকে, তা ঐ বেহুশ যাত্রীর জানা নেই। তার মন রয়েছে পূর্বদিকে। সে তার ঘোড়ার পেছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। লাগাম টানাটানি করে এবং সজোরে চাবুক মেরে সে ঘোড়াকে পিছন দিকে ফিরিয়ে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কয়েক পা সে ঘোড়াকে পিছন দিকে টেনেও নেয়। কিন্তু আবার কাফেলার গতি এবং নিজের স্বভাবগত ঝোঁকপ্রবণতায় বাধ্য হয়ে ঘোড়া সেই পশ্চিম দিকেই ছুটতে থাকে। মোটকথা, এভাবে ঐ যাত্রী বারবার নিজের মন ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ মঞ্জিলের

দিকেই যেতে বাধ্য হয়, কিন্তু এক সার্থক ও সফলকাম যাত্রীর মতো নয়, বরং এক ব্যর্থ এ বিফলকাম যাত্রীর মতো। কারণ যেটাকে সে তার মঞ্জিলে মাকসুদ মনে করেছে, সে পর্যন্ত পৌঁছার সৌভাগ্য তার হয় না, আবার যেখানে সে কার্যত গিয়ে পৌঁছে, সেটা না তার গন্তব্যস্থল, আর না সেখানে থাকার কোন প্রস্তুতি, সে গ্রহণ করে।

• দুই: ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আকর্ষিক শক্তি- দ্বীন ইসলামের গোটা ব্যবস্থাপনার কেন্দ্র ও ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর সত্তা। সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনাই ঐ কেন্দ্রের চারদিকে আবর্তন করছে। এই ব্যবস্থাপনায় যা কিছু রয়েছে-তা মনন ও প্রত্যয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক আর পূজা-উপাসনা ও ইবাদাত-বন্দেগীর সাথে সম্পৃক্ত হোক অথবা তা দুনিয়াবী জীবনের কোন কাজই হোক- তার প্রতিটি জিনিসেরই গতি ঐ কেন্দ্রীয় সত্তার দিকেই। খোদ দ্বীন (আনুগত্য) ও ইসলাম (আত্মসমর্পণ) শব্দ দু'টি-যার থেকে এই ধর্মীয় ব্যবস্থাপনাটি উদ্ভাবিত হয়েছে- তার এই প্রকৃত ও নিগূঢ় তত্ত্বকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে প্রমাণ করে। দ্বীন ও ইসলাম শব্দের মানেই হচ্ছে, বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির সামনে মাথা নত করবে এবং তাঁরই ইচ্ছার অনুগত হবে।

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে মাথা নত করে দিয়েছে এবং সে সৎকর্মশীলও তার চেয়ে উত্তম দ্বীন আর কার হবে।"-*(সূরা আন নিসা: ১২৫)*

এই কারণেই ইসলামের প্রতিটি জিনিস আল্লাহরই জন্যে নির্ধারিত। নামায যদি আল্লাহর জন্যে না হয় তাহলে তা একটি অর্থহীন ওঠা-বসা ছাড়া আর কিছু নয়। রোযা যদি আল্লাহর জন্যে না হয় তাহলে তা হবে শুধু উপবাসের শামিল। যাকাত ও দান-খয়রাত যদি আল্লাহর জন্যে হয় তবে তা হবে আল্লাহর পথে ব্যয়, নচেৎ তা হবে শুধু অপব্যয় ও অপচয়। যুদ্ধ ও জিহাদ যদি খালেছ আল্লাহর পথে হয়, তবে তা হবে শ্রেষ্ঠতম ইবাদত, নচেৎ তা হবে শুধু ফেতনা - ফাসাদ আর নিছক রক্তপাত। এভাবে ইসলামের নির্দেশিত অন্যান্য কাজগুলো যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা হয়, তবে তা হবে সৎ ও প্রতিদানযোগ্য কাজ, নতুবা তা হবে নিষ্ফল ও অর্থহীন কাজ। আর যেগুলো ইসলাম নিষেধ করেছে, তাথেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে বিরত থাকলে তা হবে

ফলপ্রসু, নতুবা তা হবে একেবারেই পণ্ডশ্রম। এই লক্ষ্যটি যদি না হতো, তাহলে দ্বীন ইসলামে এরূপ শৃঙ্খলাও বজায় থাকতো না।

• তিন: চিন্তা ও কর্মের একমুখিনতা- এই লক্ষ্যটি যেমন ইসলামের ধর্মীয় ব্যবস্থায় এককেন্দ্রিকতা, একমুখিনতা ও নিয়ম-শৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, তেমনি মানুষের চিন্তা ও কল্পনায়, ইচ্ছা ও মননে এবং আকীদা ও আচরণে এক পরিপূর্ণ একমুখিনতা জন্ম দেয়। পরন্তু এই একমুখিনতার সাথে তার দৃষ্টিকে এমন এক উচ্চতম লক্ষ্যবিন্দু ও মহত্তম উদ্দেশ্যের দিকে নেয়, যার চেয়ে বেশী উন্নত বা উচ্চ পর্যায়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আর হতেই পারে না। শুধু স্বভাবগত কামনার পরিতৃপ্তি কিংবা প্রবৃত্তিগত স্বার্থ লাভ অথবা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য পূরণই যে ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য হবে, তার চিন্তা ও কর্মে কখনো একমুখিনতা আসতে পারে না। কারণ, বুদ্ধি ও মনোগত ক্রমবিকাশ এবং দৃষ্টি ও কর্মের প্রসারণের প্রত্যেক পর্যায়ে তার ভেতর নতুন কামনা ও বাসনার সৃষ্টি হবে এবং নতুন নতুন জিনিসকে সে নিজের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করতে থাকবে। জ্ঞান ও বুদ্ধির কোন উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে মানুষ এমন সব প্রকৃতিগত কামনা এবং আধ্যাত্মিক ও প্রবৃত্তিগত দাবীর ওপর অবিচল থাকে, যা এর পরবর্তী নিম্নতর পর্যায়ে তার পক্ষে দৃষ্টি আকর্ষণকারী ও কর্মপ্রেরণাদানকারী ছিল - এটা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এভাবে এক উদ্দেশ্য থেকে অন্য উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হতে হতেই মানুষের সমস্ত জীবন শেষ হয়ে যাবে এবং তার চিন্তাধারায় পরিপূর্ণ একমুখিনতা সৃষ্টি করতে এবং তাঁর গোটা চিন্তা ও কর্মশক্তিকে নিয়োজিত করতে পারে, এমন কোনো কেন্দ্রীয় ভাবধারাই তার মনের ভেতর বদ্ধমূল হতে পারে না। এ বৈশিষ্ট্য ইসলামী লক্ষ্যের ভেতরেই রয়েছে যে জ্ঞান ও বুদ্ধির যে কোন পর্যায়ে সে মানুষের একমাত্র জীবন লক্ষ্য হতে পারে এবং কোন উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছেও তাকে বদলাবার কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় না। কারণ জ্ঞান ও বুদ্ধির যতো উচ্চ পন্থাই আমরা কল্পনা করি, আল্লাহর সত্তা তার চেয়েও মহান ও উন্নত। এছাড়া অতি তুচ্ছতম পর্যায় থেকে অতুচ্ছ পর্যায় পর্যন্ত যে কোন লোকের সাথেই তার সম্পর্ক সমান। এ ব্যাপারে কোনো পার্থক্য থাকলে তা শুধু আমাদের বুদ্ধি-জ্ঞান ও চেতনার পার্থক্যের দিক দিয়েই রয়েছে।

• চার: খালেছ মানবীয় সমাজ সংগঠন-আবার এ লক্ষ্যটি যেমন এক ব্যক্তির জীবন লক্ষ্য হতে পারে, তেমনি একটি সমাজ, একটি জাতি বরং গোটা মানব জাতিরই লক্ষ্য হতে পারে। কারণ যে আত্মসর্বস্বতা এবং ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক স্বার্থপরতার স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে মানবতাকে বংশ-গোত্র-সম্প্রদায় এবং ব্যক্তি ও ব্যষ্টিতে বিভক্ত করে দেয়া এবং তাদের ভেতর পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিরোধ সৃষ্টি এবং শত্রুতা ও পরশ্রীকাতরতার মনোভাব জাগিয়ে দেয়া, এ লক্ষ্যের ভেতর তার কোনো উপাদানই বর্তমান নেই এবং যে মহান সত্তার সাথে গোটা মানব জাতি তথা গোটা বিশ্বপ্রকৃতির সমান সম্পর্ক বিদ্যমান এবং যার প্রতি নিবিষ্ট হবার পর প্রতিটি দিক থেকে মানবীয় উদ্দেশ্যের ভেতর ঐক্য ও একত্বের সৃষ্টি হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে সাহায্য-সহায়তা ও সৌভ্রাতৃত্ব ভাবধারা সৃষ্টি হয়, এ লক্ষ্যটি মানুষকে সেদিকে নিবিষ্ট করে দেয়। দুনিয়ায় যত বৈষয়িক উদ্দেশ্য রয়েছে, তার কোনো একটিতে দু'জন মানুষও একে অপরের সত্যিকার সহায়ক হতে পারে না। ভাই-ভাই, পিতা-পুত্র এবং মাতা-কন্যার পক্ষেও এক বৈষয়িক উদ্দেশ্য একত্রিত হয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, এমনকি বৈরিতা ও শত্রুতা থেকে বেঁচে থাকা পর্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এসব কিছু হচ্ছে পার্থিব স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের সবচেয়ে মৌলিক উপাদান আত্মসর্বস্বতা ও স্বার্থপরতার ফল। কিন্তু আল্লাহর সত্তা হচ্ছে সকল পরিণতির শেষ পরিণতি, কোনোরূপ দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা প্রতিরোধ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে এবং কেউ কারো স্বার্থে সংঘর্ষ না লাগিয়ে লক্ষ্য কোটি মানুষ একই সময় তার দিকে ছুটে যেতে পারে। বরঞ্চ এ যাত্রাপথের প্রত্যেক যাত্রীই আন্তরিকতার সাথে অন্য যাত্রীর সাহায্য করে, নিজের ওপর অন্যের আরামকে অগ্রাধিকার দেয় এবং অন্যের পরিশ্রমের তুলনায় নিজে বেশী পরিশ্রম করতে চায়। আরাম আয়েশের সাথে চলার চেয়ে নিজ সহযাত্রীর বোঝা বহন করে, অন্যের খেদমত করে, বিনয়ের সাথে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়া এবং নিজ মালিকের অধিক পরিমাণে সন্তুষ্টি অর্জন করাকে অনেক বেশী উত্তম মনে করে।

বস্তুত, বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও মৌলিক সীমারেখার বৈষম্যকে নিশ্চিহ্ন করে এক বিশ্বব্যাপী জাতীয়তার রূপায়ণ এবং আন্তর্জাতিক মানব সংঘের সংগঠনের জন্যে যে কেন্দ্রীয় ভাবধারার প্রয়োজন, তা এ লক্ষ্যের ভেতরেই পূর্ণমাত্রায় বর্তমান রয়েছে। এ ধরনের বিশ্বব্যাপী সংস্কৃতির জন্যে এর চেয়ে উত্তম আর কোন লক্ষ্যই নেই। কারণ তা এক দিকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে একেবারে বিলুপ্তও করে দেয় না, আবার অন্য দিকে ব্যক্তিত্বের সকল বিকেন্দ্রিক প্রবণতাকে নিশ্চিহ্ন করে এক খালেছ মানবীয় সমাজে তাকে সন্নিবেশিত করে দেয়।

•পাঁচ: গৌণভাবে সকল উদ্দেশ্যের সফলতা- এ লক্ষ্যের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য এই যে, দুনিয়ায় ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক দিক দিয়ে মানুষের যতো উদ্দেশ্য হতে পারে, এর নিরূপণের সাথে সাথে তা সবই গৌণভাবে হাসিল হয়ে যায়। এ জন্যে ঐগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে লক্ষ্য বানানোর কোনো প্রয়োজন হয় না। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সাথে সাথে যে জিনিসগুলো অনিবার্যভাবে হাসিল হয়ে থাকে, কুরআন মজীদ এক একটি করে তার সবই উল্লেখ করেছে। পার্থিব জীবনে মানুষের সবচেয়ে বড়ো চাওয়া হচ্ছে শান্তি, নিরাপত্তা, নিশ্চিন্ততা ও মানসিক প্রশান্তি। কুরআন বলে যে, আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হও ও তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করো, এ জিনিসটি তোমরা আপনা আপনিই লাভ করবে। এ থেকে জানা গেলো যে, অন্যান্যরা যতো জিনিসকে কাম্য ও অভীষ্ট বলে ঘোষণা করেছে, ইসলাম সে সবের প্রতি দৃকপাত পর্যন্ত করেনি, বরং যে বস্তুটি অর্জনের ফলে এসব জিনিস আপনা-আপনি হাসিল হয়ে যায়, ইসলাম সেটিকেই তার লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিয়েছে। অন্যান্যরা যেসব জিনিসকে নিজেদের লক্ষ্য বলে, সেগুলোর অন্বেষণে মুসলমান তার অন্তকরণকে এক মুহূর্তের জন্যেও লিপ্ত করবে, তার দৃষ্টিতে তা এতটুকু উপযোগীও নয়। তার সামনে তো ঐ সকল লক্ষ্য এবং সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুর চেয়ে উন্নত ও সুউচ্চ এক মহান লক্ষ্য রয়েছে। সে ভালো করেই জানে যে, এ উচ্চতম লক্ষ্যে যখন সে উপনীত হবে, তখন এর অধীনস্থ প্রতিটি জিনিস আপনা-আপনিই সে পেয়ে যাবে। ইমারতের সবচেয়ে উপরের তলায় আরোহণ করলে মধ্যবর্তী তলাগুলো যেমন

আরোহণকারীর পায়ের নীচে থাকে, মুসলমান তার লক্ষ্যে পৌঁছে ঠিক সেরূপ অবস্থাই দেখতে পায়।

• ছয়: তাকওয়া ও সৎকর্মশীলতার সর্বোত্তম প্রেরণা – এর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইসলাম পরহেযগারী ও সৎকর্মশীলতার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তার জন্যে ন্যায় ও অন্যায়ের যে বিধি-নিষেধ দিয়েছে, মানুষকে তা পালন করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্তে এ লক্ষ্যটিই একমাত্র মার্জিত ও পবিত্র লক্ষ্য হতে পারে। দুনিয়ায় সৎকাজ যে শুধু সৎকাজ বলেই করা উচিত আর দুষ্কৃতিকে কেবল দুষ্কৃতির কারণেই বর্জন করা উচিত- এমন কথা বলার মতো লোকের কোনো অভাব নেই। কিন্তু এ ধরনের কথা যারা বলেন, এর প্রকৃত তাৎপর্যটা পর্যন্ত তাদের জানা নেই। নিছক সৎকাজের খাতিরে সৎকাজ করার মানে হচ্ছে এই যে, সৎকাজের সাথে কোনো কল্যাণ ও উপকারিতার সম্পর্ক নেই; সৎকাজ সৎকাজই, আর এ কারণেই তা মানুষের অভীষ্টও হতে পারে। অনুরূপভাবে শুধু দুষ্কৃতির জন্যেই দুষ্কৃতি থেকে বিরত থাকার অর্থ হচ্ছে এই যে, সমস্ত ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন করে দুষ্কৃতি তার নিজস্ব চরিত্রেই দুষ্কৃতি, যেনো তার চরিত্রটাই মানুষের পক্ষে বর্জনীয় হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ায় মানুষের জন্যে এমন নির্ভেজাল সৎকাজের কোন অস্তিত্ব নেই, যা মানুষের ব্যক্তি সত্তার প্রতি আরোপিত হবার উপযোগী সকল ফায়দা ও কল্যাণ থেকে মুক্ত। আর না এমন খালেছ দুস্কৃতির অস্তিত্ব আছে, যা মানুষের ব্যক্তি সত্তাকে প্রভাবিত করার মতো অনিষ্টকারিতা থেকে শূন্য। বরং সত্য কথা এই যে, লাভ ও ক্ষতি তথা উপকারিতা ও অনিষ্টকারিতার অভিজ্ঞতা থেকে মানুষের মনে সৎকাজ ও দুষ্কৃতির ধারণার জন্ম হয়েছে। যে কাজ দ্বারা মানুষের প্রকৃতই কোন উপকার হয়, দৃশ্যত তার ভিতরে কিছু অপকারিতা থাকলেও, মানুষ তাকেই সৎকাজ বলে অভিহিত করে। আবার যে কাজ দ্বারা তার যথার্থই কোন ক্ষতি সাধিত হয়, বাহ্যদৃষ্টিতে তার ভেতর কিছু উপকারিতা থাকলেও, মানুষ তাকেই দুষ্কৃতি বলে আখ্যায়িত করে। কোন কাজকে যদি লাভ ও ক্ষতির বিশেষণ থেকে মুক্ত করে নেয়া হয় এবং কাজটি শুধু একটি ক্রিয়াই থেকে যায়, তবে আমরা তাকে সৎকাজ বা দুষ্কৃতি এর কোনটাই আখ্যা দিতে পারি না। একথা নিসন্দেহ যে, সৎকাজের অভ্যাস

দৃঢ়তর হওয়া এবং উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে উপনীত হবার পর মানুষের পক্ষে লাভ ও ক্ষতির ধারণা থেকে মুক্ত হয়েও নিছক সৎকাজের খাতিরে সৎকাজ করা এবং দুষ্কৃতির জন্যেই দুষ্কৃতি থেকে বিরত থাকা সম্ভবপর। কিন্তু প্রথমত এটা শুধু কল্যাণ ও অকল্যাণের উৎস সম্পর্কে বিস্মৃতি মাত্র, উৎসের অপসারণ নয়; দ্বিতীয়ত এটা শুধু দার্শনিকদের কল্পনার স্বর্গারোহণ মাত্র, কার্যত বড়ো বড়ো বিজ্ঞানীরও এ পর্যন্ত পৌঁছার সৌভাগ্য হয়নি। কাজেই সাধারণ লোকেরা নিছক সৎকাজ অবলম্বন ও দুষ্কৃতি পরিহারকে কিভাবে আপন লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারে?

এ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, সৎকাজ ও দুষ্কৃতির ধারণাকে লাভ ও ক্ষতির ধারণা থেকে পৃথক করা যেতে পারে না। সৎকাজের ভেতরে যতক্ষণ না কোন কল্যাণকারিতা নিহিত থাকবে, ততক্ষণ তা মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে না। ঠিক তেমনিভাবে দুষ্কৃতির ভেতরে কোনো অনিষ্টকারিতা প্রচ্ছন্ন না থাকলে তাকে বর্জনীয় বলে আখ্যা দেয়া যেতে পারে না। এবার যদি আমরা পরহেযগারী ও সৎকর্মশীলতাকে স্বার্থপরতার তুচ্ছ পর্যায় থেকে স্বার্থহীনতা ও ঐকান্তিকতার উচ্চপর্যায়ে উন্নীত করা এবং তাকে এক নির্বিশেষ ও সার্বজনীন নৈতিক বিধানের ভিত্তি বলে অভিহিত করতে চাই, তাহলে তার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে এই যে, লাভ ও ক্ষতির এমন একটি মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা হবে বস্তুসর্বস্বতা ও স্বার্থপরতার চেয়ে উন্নততর যার ভিত্তিতে সর্ববিধ বৈষয়িক ও মানবিক ক্ষতি দ্বারা পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও একটি সৎকাজ মানুষের চোখে শুধু কল্যাণময় বলেই প্রতিভাত হবে এবং সবদিক দিয়ে মঙ্গলময় হওয়া সত্ত্বেও একটি পাপ কাজকে শুধু ক্ষতিকারক বলেই মনে হবে। ইসলাম এ পন্থাটিই অবলম্বন করেছে। সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন না অর্জনকে লাভ ও ক্ষতির একমাত্র মানদণ্ড বলে ঘোষণা করেছে। এ মানদণ্ড বৈষয়িক স্বার্থপরতামূলক পংকিলতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। এ মানদণ্ড অনুযায়ী একজন সৎকর্মশীল মানুষ আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্যে নিজের জান, মাল, সন্তানাদি, সুনাম, সুখ্যাতি ইত্যদি কুরবান করেও এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, সে লাভবান হয়েছে। আবার একজন দুষ্কৃতিপরায়ণ মানুষ আল্লাহর গযব ডেকে আনার পর দুনিয়ার সকল বৈষয়িক ও স্বার্থপরতামূলক ফায়দা হাসিল করেও এ ভয় পোষণ করে যে, সে ক্ষতির

মধ্যে রয়েছে। এ জিনিসটাই মানুষকে পার্থিব লাভ ও ক্ষতির প্রতি বেপরোয়া করে নিঃস্বার্থচিত্তে পরহেযগারী ও সৎকর্মশীলতা অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

এ পর্যন্ত দু'টি বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথম এই যে, ইসলাম কোন জিনিসটাকে জীবনের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছে। দ্বিতীয় এই যে, কি কি কারণে তা একটি উত্তম লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়েছে? এবার এ প্রশ্নের তৃতীয় দিকের প্রতি আমাদের আলোকপাত করতে হবে। আর তা হলো এই যে, ইসলামী সংস্কৃতিকে একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতির রূপদানে এ লক্ষ্যটির ভূমিকা কি এবং এ সংস্কৃতিকে সে কোন্ বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছে?

সংস্কৃতির ভিত রচনায় ঈমানের স্থান

যদি বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের আকীদা ও চিন্তাধারার প্রতি ঈমান রাখে এবং তাদের চরিত্র বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে কোনো সামাজিক ও সামগ্রিক সংস্থাই গঠিত হতে পারে না। তাদের দৃষ্টান্ত হলো, যেমন কোনো ময়দানে অনেকগুলো পাথর বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে; প্রতিটি পাথরের নিজস্ব দৃঢ়তা আছে বটে, কিন্তু তাদের ভেতরে কোনো সম্পর্ক সূত্র নেই। পক্ষান্তরে যদি একটি অখন্ড ভাবধারা বহু সংখ্যক লোকের মনে ঈমান হিসেবে বদ্ধমূল হয় তো ঈমানের এ ঐক্য সূত্রই তাদেরকে একটি জাতিতে পরিণত করবে-যেমন করে ঐ বিক্ষিপ্ত পাথরগুলোকেই চুন - সিমেন্ট দ্বারা গেঁথে দেয়া হলে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর দাঁড়িয়ে যাবে। এবার তাদের মধ্যে যথারীতি সহায়তা ও সহযোগিতা শুরু হয়ে যাবে, এর ফলে তাদের উন্নতির গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকবে। একই ধরনের ঈমান তাদের চরিত্রে সামঞ্জস্য এবং বাস্তব ক্রিয়া-কাণ্ডে সাদৃশ্যের সৃষ্টি করবে। এর ফলে একটি বিশেষ তমদ্দুন জন্মলাভ করবে, এক বিশিষ্ট সংস্কৃতি আত্মপ্রকাশ করবে। এক নতুন জাতির অভ্যুদয় ঘটবে এবং সংস্কৃতির ভবনকে এক নতুন পদ্ধতিতে নির্মিত করবে।

এ আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, যে মৌলিক চিন্তাধারা একটি সংস্কৃতির অনুগামীদের মধ্যে ঈমানরূপে বদ্ধমূল হয়ে যায়, সে সংস্কৃতিতে তার গুরুত্ব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

ইসলামী সংস্কৃতিতে ঈমানের গুরুত্ব

ঈমানী বিষয়বস্তুর সামগ্রিক পর্যালোচনা :

ঈমানের পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাতে এর প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে ইসলামের বিস্তৃত প্রত্যয়, নির্ভুল মাপকাঠির বিচারে তার বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদা, মানবীয় চরিত্রের ওপর তার প্রভাব এবং সংস্কৃতির ভিত রচনায় তার ভূমিকা স্পষ্টত জানা গেছে। এবার ঈমানের এ বিষয়গুলো মিলে কি ধরনের সংস্কৃতির জন্ম দেয়, তার প্রতি একবার সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখা দরকার। ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর হচ্ছে পার্থিব জীবন সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণা। তা হলো এই যে, এ দুনিয়ায় মানুষের মর্যাদা সাধারণ সৃষ্ট বস্তুর মতো নয়, বরং তাকে এখানে বিশ্ব প্রভুর তরফ থেকে প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। এ ধারণার প্রেক্ষিতে একটি যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত হিসেবে আপন স্রষ্টা ও মনিবের সন্তুষ্টি অর্জন করা মানব জীবনে স্বাভাবিক লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, আর এ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে প্রয়োজন হয়ে পড়ে:

প্রথমত, আল্লাহ সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করা।

দ্বিতীয়ত, শুধু আল্লাহকেই আদেশ ও নিষেধকারী, আইন ও বিধানদাতা, বন্দেগী ও আনুগত্য লাভের যোগ্য মনে করা এবং নিজের যাবতীয় ক্ষমতা ইখতিয়ারকে সম্পূর্ণ খোদায়ী বিধানের অধীন করে দেয়া।

তৃতীয়ত, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার বিশেষ প্রণালী ও পদ্ধতিগুলো জানা।

চতুর্থত, আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের সুফল এবং অসন্তুষ্টি বিধানের কুফল অবহিত হওয়া, যাতে করে পার্থিব জীবনের অসম্পূর্ণ ফলাফল থেকে কেউ প্রতারিত না হয়।

বস্তুত ইতিপূর্বে যে পাঁচটি প্রত্যয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে, তা এ বুনিয়াদী প্রয়োজনই পূরণ করছে।

আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে কুরআনে যা কিছু বিবৃত হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হলো: যে মহান সত্তার তরফ থেকে মানুষকে প্রতিনিধি বানিয়ে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে এবং যাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করাই তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য, তাঁর সম্পর্কে যেনো সে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করতে পারে। তেমনি ফেরেশতাদের সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হলো: মানুষ যেনো বিশ্ব প্রকৃতির ক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর কোনটিকে প্রভু মনে করে না বসে এবং প্রভুত্বের ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে শরীকদার ঘোষণা না করে। এরূপ নির্ভুল জ্ঞান লাভের পর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার তাৎপর্য হলো: বিশ্বপ্রকৃতির ওপর, এমন কি স্বয়ং মানব জীবনের অচেতন দিকের ওপর যেমন আল্লাহর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব বিরাজমান, তেমনি জীবনের সজ্ঞান ও সচেতন দিকেও মানুষ শুধু আল্লাহরই কর্তৃত্ব স্বীকার করবে। প্রতিটি ব্যাপারে আল্লাহকেই আইন প্রণেতা এবং নিজেকে সেই আইনের অনুবর্তী জ্ঞান করবে। নিজের ক্ষমতা ইখতিয়ারকে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার অধীন করে দেবে। বস্তুত এরূপ ঈমানী শক্তিই মানুষকে আল্লাহর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের সামনে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে মাথা নত করে দেয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এর দ্বারা মর্দে-মু'মিনের ভেতর এক বিশেষ ধরনের বিবেকের সৃষ্টি হয় এবং এক বিশেষ ধরনের চরিত্র গড়ে উঠে-যা আল্লাহর আইন-বিধানে বাধ্যতামূলক নয়, বরং স্বেচ্ছামূলক অনুসৃতির জন্যে একান্ত প্রয়োজন।

তৃতীয় প্রয়োজনটি পূর্ণ করে নবুওয়াত ও কিতাবের প্রতি বিশ্বাস। এ দু'টির মাধ্যমেই মানুষ তার জন্যে আল্লাহর নির্ধারিত আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান লাভ করে। মানুষের ক্ষমতা ইখতিয়ারকে আল্লাহ যেসব সীম্মারেখার অধীন করে দিয়েছেন, এ দু'টির মাধ্যমেই মানুষ সেগুলো চিনে নিতে পারে। 'ঈমান বির রিসালাত' এবং 'ঈমান বিল কিতাবের' মানেই হচ্ছে রসূলের শিক্ষাকে আল্লাহর শিক্ষা এবং তাঁর পেশকৃত কিতাবকে আল্লাহর কিতাব মনে করা। আর এ ঈমানের বলেই আল্লাহর রসূল

ও তাঁর কিতাবের মাধ্যমে প্রদর্শিত বিধি-ব্যবস্থা, আইন-কানুন ও রীতিনীতি, দৃঢ়তা ও সংকল্পের সাথে পালন করার মতো যোগ্যতা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে।

চতুর্থ বা সর্বশেষ প্রয়োজনটি পূর্ণ করার জন্যে রয়েছে পরকাল সংক্রান্ত জ্ঞান। এর দ্বারা মানুষের দৃষ্টি এতো প্রখর হয়ে যায় যে, দুনিয়াবী জীবনের এ বাহ্যদৃশ্যের পেছনে সে এক স্বতন্ত্র জগতের অস্তিত্ব দেখতে পায়। তার স্পষ্টত মনে হয় যে, এ দুনিয়ার মঙ্গল-অমঙ্গল ও উপকার-অপকার আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কোনো মাপকাঠি নয়। আল্লাহর তরফ থেকে কর্মের সুফল ও কুফল এ দুনিয়ায় শেষ হয়ে যায় না, বরং তার চূড়ান্ত ফয়সালা ও ফলাফল ঘোষিত হবে স্বতন্ত্র এক জগতে। এবং সেই ফয়সালাই হবে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য। সেই ফয়সালায় সাফল্য ও কামিয়াবী লাভ করতে হলে এ দুনিয়ায় খোদায়ী আইন-বিধানের নির্ভুল অনুসরণ এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখার পূর্ণ সংরক্ষণই হচ্ছে একমাত্র উপায়। এ জ্ঞান ও বিশ্বাসের প্রতি সুদৃঢ় প্রত্যয়কেই বলা হয় ঈমান বিল আখেরাত বা পরকাল বিশ্বাস। বস্তুত ঈমান বিল্লাহর পর মানুষকে ইসলামী আইন-কানুনের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে এটিই হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকরী শক্তি। আর ইসলামী সংস্কৃতির জন্যে মানুষকে মানসিক দিক থেকে যোগ্য ও সমর্থ করে তোলার ব্যাপারেও এ প্রত্যয়টির রয়েছে বিরাট ভূমিকা।

এ আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে ইসলামের বিশিষ্ট ধারণা ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য ইতিপূর্বে যে ধারাগুলো এঁকে দিয়েছিলো, আলোচ্য মৌল প্রত্যয়গুলো ঠিক সেই ধারায়ই সংস্কৃতির সংগঠন ও ভিত্তি স্থাপন করেছে। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে এমনি সংস্কৃতির জন্যে যে মৌল প্রত্যয়ের প্রয়োজন, তা এ পাঁচটি বিষয় নিয়েই গঠিত হতে পারে। এ ছাড়া অন্য কোন প্রত্যয়ের ভেতরেই এ বিশেষ ধরনের সংস্কৃতির ভিত্তি হওয়ার মতো যোগ্যতা নেই। কারণ অন্য কোনো প্রত্যয়ই জীবন সম্পর্কে এ বিশেষ ধারণা ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

ইসলামী সংস্কৃতির কাঠামো

ঈমান তথা ইসলামের প্রত্যয়বাদ সম্পর্কে ওপরের বিস্তৃত আলোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই এর ভিত্তির ওপর গড়া সংস্কৃতির একটা পূর্ণ কাঠামো আমাদের সামনে এসে পড়ে। এ কাঠামোর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপঃ

• এক : এ সংস্কৃতির ব্যবস্থাপনা একটি রাজ্যের ব্যবস্থাপনার মতো। এতে আল্লাহর মর্যাদা সাধারণ ধর্মীয় মত অনুসারে নিছক একজন 'উপাস্যে'র মতো নয়। বরং পার্থিব মত অনুযায়ী তিনি সর্বোচ্চ শাসকও। প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন এ বিশাল রাজ্যের বাদশাহ শাহানশাহ। রসূল তাঁর প্রতিনিধি। কুরআন তাঁর আইন গ্রন্থ। যে ব্যক্তি তাঁর বাদশাহীকে স্বীকার করে তাঁর প্রতিনিধির আনুগত্য এবং তাঁর আইন গ্রন্থের অনুসরণ করে, সেই এ রাজ্যের প্রজা। মুসলমান হওয়ার মানেই হচ্ছে এই যে, সেই বাদশাহ তাঁর প্রতিনিধি ও আইন গ্রন্থের মাধ্যমে যে আইন বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন-তার কার্যকারণ ও যৌক্তিকতা বোধগম্য হোক কি না হোক- বিনা বাক্য ব্যয়ে তার স্বীকার করতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর এ সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং তাঁর আইন বিধানকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সিদ্ধান্তের উর্ধে স্থান দিতে স্বীকৃত না হবে এবং তাঁর আদেশাবলী মানা বা না মানার অধিকারকে নিজের জন্যে সুরক্ষিত রাখবে, তার জন্যে এ রাজ্যের কোথাও এতটুকু স্থান নেই।

• দুই : এ সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্যের (অর্থাৎ পরকালীন বিচারে বিশ্ব প্রভুর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হওয়ার) জন্যে প্রস্তুত করা আর তার দৃষ্টিতে এ সাফল্য অর্জনটা বর্তমান জীবনে মানুষের নির্ভুল আচরণের ওপর নির্ভরশীল। পরন্তু চূড়ান্ত ফলাফলের দৃষ্টিতে কোন্ সব কাজ উপকারী, আর কোন্ সব কাজ অপকারী, তা জানা মানুষের সাধ্য নয়, বরং আখেরাতে ফয়সালাকারী আল্লাহই তা উত্তমরূপে অবহিত। এ কারণেই এ সংস্কৃতি জীবনের সকল বিষয়াদিতে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করার এবং নিজের কর্ম স্বাধীনতাকে খোদায়ী শরীয়ত দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে মানুষের কাছে দাবী জানায়। অনুরূপভাবে এ সংস্কৃতি হচ্ছে দ্বীন ও দুনিয়ার এক মহত্তম সমন্বয়। একে প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে 'ধর্ম' নামে আখ্যায়িত করা চলে না।

এ হচ্ছে একটি ব্যাপকতর জীবনব্যবস্থা বা মানুষের চিন্তা-কল্পনা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, পারিবারিক কাজ-কর্ম, সামাজিক ক্রিয়া-কাণ্ড, রাজনৈতিক কর্মধারা, সভ্যতা ও সামাজিকতা সবকিছুর ওপরই পরিব্যাপ্ত। আর এ সমস্ত বিষয়ে যে পদ্ধতি ও আইন-বিধান আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তারই সামষ্টিক নাম হচ্ছে 'দ্বীন ইসলাম' বা 'ইসলামী সংস্কৃতি'।

• তিন : এ সংস্কৃতি কোন জাতীয়, (ভৌগলিক বা ভাষাগত অর্থে) দেশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয়। বরং সঠিক অর্থে এটি হচ্ছে মানবীয় সংস্কৃতি। এ মানুষকে শুধু মানুষ হিসেবেই আহ্বান জানায়। যে ব্যক্তি তাওহীদ, রিসালাত, কিতাব ও পরকালের প্রতি ঈমান পোষণ করে, তাকেই সে নিজের চৌহদ্দির মধ্যে গ্রহণ করে। এমনিভাবে এ সংস্কৃতির এক বিশ্বব্যাপী উদার জাতীয়তা গঠন করে – যার মধ্যে বর্ণ-গোত্র-ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষই প্রবেশ করতে পারে। তার মধ্যে রয়েছে সমগ্র দুনিয়ার বুকে বিস্তৃত হবার মতো অনন্য যোগ্যতা। সমগ্র আদম সন্তানকে একই জাতীয় সূত্রে সম্পৃক্ত করার এবং তাদের সবাইকে একই সংস্কৃতির অনুসারী করে তোলার মতো যোগ্যতারও সে অধিকারী। কিন্তু এ বিশ্বব্যাপী মানবীয় ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা দ্বারা তার আসল লক্ষ্য শুধু নিজ অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করারই নয়, বরং মানব জাতির রব তার মঙ্গল ও ভালাইর জন্যে যে নির্ভুল জ্ঞান ও কর্মনীতি দান করেছেন, সমগ্র মানুষকে তার সুফলের অংশীদার করে তোলাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এ কারণেই এ ভ্রাতৃসংঘে শামিল হবার জন্যে প্রথমত সে ঈমানের শর্ত আরোপ করেছে এবং সেই সাথে যারা আল্লাহর সর্বোচ্চ ক্ষমতার সামনে মাথানত করতে প্রস্তুত এবং আল্লাহর রসূল ও তাঁর কিতাবের দ্বারা নির্ধারিত সীমারেখা ও আইন-বিধান পালন করতে ইচ্ছুক, কেবল তাদেরকেই এ সংঘের জন্যে মনোনীত করেছে। কারণ এ ধরনের লোকেরাই শুধু (তারা সংখ্যায় যতো অল্পই হোক) এ সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় খাপ খাওয়াতে পারে এবং এদের দ্বারাই একটি নির্ভুল ও সুদৃঢ় জীবন- ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে। এ ব্যবস্থায় অবিশ্বাসী, মুনাফেক বা ক্ষীণ বিশ্বাসী লোকদের স্থান পাওয়া এর শক্তির লক্ষণ নয়, বরং তা দুর্বলতারই লক্ষণ।

• চার : সীমাহীনতা ও বিশ্বজনীনতার সাথে এ সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রচণ্ড নিয়মানুবর্তিতা (Discipline) এবং শক্তিশালী বন্ধন। এর সাহায্যেই সে নিজের অনুসারীদেরকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক থেকে নিজস্ব আইনের অনুগত করে তোলে। এর কারণ এই যে, আইন প্রণয়ন ও সীমা নির্ধারণ করার পূর্বে সে আইনের অনুসরণ ও সীমা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করে নেয়। অন্য কথায়, আদেশ দেয়ার পূর্বেই সে আদেশ দ্বারা কার্যকরী হওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে। এ জন্যে সর্বপ্রথমে সে মানুষের আল্লাহর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়। তারপর তাকে এ নিশ্চয়তা দেয় যে, রসূল ও কিতাবের মাধ্যমে যে বিধান দেয়া হয়েছে তা আল্লাহরই বিধান এবং তার আনুগত্য ঠিক আল্লাহরই আনুগত্য। পরন্ত তার মনের ভেতর সে এক অতন্দ্র প্রহরী নিযুক্ত করে দেয়- সে সর্বদা ও সর্বাবস্থায় তাকে খোদায়ী বিধান পালনে উদ্বুদ্ধ করে, তার বিরুদ্ধাচরণের জন্যে তিরস্কার করে এবং পরকালীন শাস্তির ভয় দেখায়। এভাবে যখন প্রতিটি ব্যক্তির মন ও বিবেকের ভেতর এ কার্যকর শক্তিকে বদ্ধমূল করে নিজের অনুসারীদের মধ্যে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে আইনানুবর্তন, বিধি-নিষেধ পালন ও সদগুণরাজিতে বিভূষিত হওয়ার মতো যোগ্যতার সৃষ্টি করা হয়, তখনি সে তাদের সামনে নিজস্ব আইন বিধান পেশ করে, তাদের জন্যে কর্মসীমা নির্ধারণ করে, তাদের জন্যে জীবন যাত্রা প্রণালী তৈরী করে এবং নিজস্ব লক্ষ্য হাসিলের জন্যে তাদের কাছে কঠোরতর ত্যাগ করে, তাদের জন্যে কর্মসীমা নির্ধারণ করে, তাদের জন্যে জীবন যাত্রা প্রণালী তৈরী করে এবং নিজস্ব লক্ষ্য হাসিলের জন্যে তাদের কাছে কঠোরতর ত্যাগ স্বীকারের দাবী জানায়। বস্তুত এটা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থা, এর চেয়ে বিচক্ষণ পন্থা আর কিছুই হতে পারে না। এ পন্থায় ইসলামী সংস্কৃতি যে বিরাট প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করছে, অন্য কোনো সংস্কৃতি তা লাভ করতে পারেনি।

• পাঁচ : পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে এ সংস্কৃতি এক নির্ভুল সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে এবং এক সৎ ও পবিত্র জনসমাজ (Society) গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু এর অন্তর্ভুক্ত লোকেরা উত্তম চরিত্র ও সদগুণরাজিতে বিভূষিত না হওয়া পর্যন্ত এরূপ সমাজ গঠন সম্ভবপর নয়। এ কারণেই এর সভ্যদের ব্যক্তি চরিত্র সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন,

যাতে করে তারা শুধু অকেজো ও প্রক্ষিপ্ত চিন্তাধারার প্রতিমূর্তি হয়ে না থাকে। তাদের মধ্যে নির্ভুল ও বিশুদ্ধ মানসিকতা পরিস্ফুট করা প্রয়োজন, যাতে করে অতি স্বাভাবিকভাবে সৎ কর্মরাজির অনুশীলন হওয়ার মতো সুদৃঢ় চরিত্র তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে। বস্তুত ইসলাম তার সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় এ নিয়মটির প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখেছে। লোকদের ট্রেনিং-এর জন্যে ইসলাম সর্বপ্রথম তাদের মধ্যে ঈমান ও প্রত্যয়কে বদ্ধমূল করে দেয়- কারণ তাদের মধ্যে উঁচুমানের মযবুত চরিত্র সৃষ্টি করার এটাই হচ্ছে একমাত্র পন্থা। এ ঈমানের বলেই সে লোকদের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, সচ্চরিত্র, আত্মানুশীলন, সত্য প্রীতি, আত্মসংযম, সংগঠন, বদান্যতা, উদার দৃষ্টি, আত্মসম্ভ্রম, বিনয়-নম্রতা, উচ্চাভিলাস, সৎসাহস, আত্মত্যাগ, কর্তব্যবোধ, ধৈর্যশীলতা, দৃঢ়চিত্ততা, বীর্যবত্তা, আত্মতৃপ্তি, নেতৃ আনুগত্য আইনানুবর্তিতা ইত্যাকার উৎকৃষ্ট গুণরাজির সৃষ্টি করে। সেই সাথে তাদের সংঘবদ্ধতার স্বাভাবিক পরিণামে যাতে একটি উৎকৃষ্ট জনসমাজ গড়ে উঠে, তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে যোগ্য করে তোলে।

• ছয় : এ সংস্কৃতির ঈমান তথা প্রত্যয়বাদে একদিকে সচ্চরিত্র ও সৎ গুণরাজি সৃষ্টি করায় এবং তা প্রতিপালন এবং সংরক্ষণের উপযোগী সকল শক্তি বর্তমান রয়েছে। অন্যদিকে পার্থিব উন্নতি ও প্রগতির জন্যে মানুষকে সর্বদা উদ্বুদ্ধ করা এবং তাকে পার্থিব উপায়-উপকরণ উত্তমরূপে ব্যবহার করার ও আল্লাহর দেয়া শক্তি নিচয়কে সুষমভাবে প্রয়োগ করার জন্যে যোগ্য করে তোলার মতো শক্তিও এর ভেতরেই নিহিত রয়েছে। পরন্তু এ প্রত্যয়বাদই দুনিয়ায় প্রকৃত উন্নতি করার জন্যে প্রয়োজনীয় উৎকৃষ্ট গুণাবলী মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। এর মধ্যে মানুষের কর্মশক্তিকে সুসংহত করার এবং তাকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করার মতো প্রচণ্ড শক্তি বর্তমান রয়েছে। সেই সাথে এ কর্মশক্তিকে সীমাতিক্রম করতে না দেয়ার এবং সত্যিকার কল্যাণ পথ থেকে বিচ্যুত হতে না দেয়ার শক্তিও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। এভাবে যেসব গুণাবলী অন্যান্য ধর্মীয় ও পার্থিব প্রত্যয়ের মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে পাওয়া যায়, ইসলামী প্রত্যয়বাদ তা সবই একত্রে ও উৎকৃষ্টরূপে বর্তমান রয়েছে। আর যেসব বিকৃতি বিভিন্ন ধর্মীয় ও পার্থিব প্রত্যয়ে লক্ষ্য করা যায় সেইসব থেকে এ প্রত্যয়বাদ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

ইসলামী সংস্কৃতিতে ঈমানের গুরুত্ব

এ হচ্ছে ইসলামের প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতির একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামো, আমরা যদি উদাহরণত একে একটি ইমারত ধরে নেই, তাহলে বলতে হয়: এ ইমারতটিকে সুদৃঢ় করে তোলার জন্যে এর ভিত্তি ভূমিকে গভীরভাবে খনন করা হয়েছে। তারপর খুব বাছবিচার করে আরও পাকাপোক্ত ইট এর জন্যে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তা উৎকৃষ্ট সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা হয়েছে। অতপর ইমারতটি এমন জাঁকালোভাবে নির্মিত হয়েছে যে, উচ্চতায় তা আসমান পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে এবং প্রশস্তে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছে। কিন্তু এতো প্রশস্ত ও উচ্চতা সত্ত্বেও এর প্রাচীর ও স্তম্ভগুলো এতোটুকু কেঁপে ওঠে না, বরং তা পাহাড়ের ন্যায় অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এ ইমারতের দরজা জানালাগুলো এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যে, বাইরের আলো ও নির্মল বায়ু এর মধ্যে সুন্দরভাবেই প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু ধূলা, বালু, আবর্জনা ও দূষিত বায়ুকে তা আদৌ প্রবেশ করতে দেয় না। আলোচ্য ইমারতটির এ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য একটি মাত্র জিনিসের কারণে সৃষ্টি হয়েছে, আর তা হচ্ছে ঈমান। এটিই তার মূল ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে দিয়েছে। এটিই অকেজো ও নিষ্ক্রিয় উপাদান বর্জন করে উৎকৃষ্ট উপাদান গ্রহণ করেছে। এটিই কাঁচা মাটি পুড়ে পাকা ইট তৈরী করেছে। এটিই বিক্ষিপ্ত ইটগুলোকে সারিবদ্ধভাবে গেঁথে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করেছে। এর ওপরই ইমারতের প্রশস্ততা, উচ্চতা ও দৃঢ়তা নির্ভরশীল, এটি যেমন তাকে প্রশস্ততা উচ্চতা ও দৃঢ়তা দান করেছে তেমনি বাহ্যিক অনিষ্ট থেকেও তাকে সুরক্ষিত করে দিয়েছে এবং সর্বপ্রকার নির্দোষ ও পবিত্র জিনিসকে তার মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ দিয়েছে। কাজেই ঈমান হচ্ছে এ ইমারতের প্রাণ তুল্য। এটি না হলে তার কায়েম থাকা দূরের কথা, নির্মিত হওয়াই সম্ভব নয়। আর এটি দুর্বল হলে তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, ইমারতের গোটা ভিত্তিই কমজোর, তার ইটগুলো কাঁচা, তার চুন-সিমেন্ট খারাব, তার স্তম্ভগুলো টল- টলায়মান, তার প্রাচীরগুলো সুগ্রথিত নয়। তার মধ্যে প্রশস্ততা ও উচ্চতার কোন যোগ্যতা নেই। তার ভেতর বাহ্যিক অনিষ্টকে প্রতিহত করার এবং নিজের পবিত্র ও নির্দোষ জিনিসগুলোকে সুরক্ষিত রাখার মতো শক্তি নেই।

ঈমানের অনুপস্থিতি ইসলামেরই অনুপস্থিতির শামিল। অনুরূপ- ভাবে ঈমানের দুর্বলতা তারই দুর্বলতা এবং ঈমানের শক্তি তারই শক্তির নামান্তর। পরন্তু ইসলাম যেহেতু একটি ধর্ম মাত্রই নয়, বরং এটি সভ্যতা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, সামাজিকতা, রাজনীতি সবকিছুরই সমন্বয়, এ কারণে এখানে ঈমানের গুরুত্ব নিছক ধর্মীয় বিন্যাসের মতোই নয় বরং এর ওপর লোকদের গোটা নৈতিক আচরণ ও জীবনধারা একান্তভাবে নির্ভরশীল। এটিই তাদের পারস্পরিক ক্রিয়াকর্মের সুস্থতা পরিচ্ছন্নতার প্রধান অবলম্বন। এটিই তাদেরকে সংহত করে একটি জাতিতে পরিণত করে। এটিই তাদের জাতীয়তা ও সংস্কৃতির নিরাপত্তা বিধান করে। এটিই তাদের সভ্যতা, সামাজিকতা ও রাজনীতির মূল প্রাণবস্তু। এটি ছাড়া ইসলাম শুধু একটি 'ধর্ম' হিসেবে কায়েম হতে পারে না তাই নয়, বরং একটি সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। ঈমান দুর্বল হয়ে পড়লে তাকে শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসেরই দুর্বলতা বলা চলে না, বরং তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, মুসলমানদের নৈতিক জীবন খারাপ হয়ে গেছে। তাদের স্বভাব-চরিত্র দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাদের পারস্পরিক ক্রিয়াকর্ম বিগড়ে গেছে। তাদের সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। তাদের জাতীয়তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। একটি স্বাধীন, সম্মানিত ও শক্তিমান জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে তারা অক্ষম হয়ে পড়েছে।

বস্তুত এ কারণেই ইসলামী ব্যবস্থায় ঈমানকেই ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যের মাপকাঠি রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এবং একেই ইসলামী ব্যবস্থায় দাখিল হবার প্রাথমিক শর্ত রাখা হয়েছে। এক ব্যক্তি যখন ঈমান কবুল করলো, তখন সে মুসলিম জাতির মধ্যেই প্রবেশ করে; মুসলমানদের সভ্যতা, সামাজিকতা, রাজনীতি সবকিছুতে সে সমান অংশীদার হয় এবং সমস্ত রীতিনীতি ও আইন-কানুন তার প্রতি বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। কিন্তু সে যদি ঈমান কবুল না করে তাহলে ইসলামের সীমার মধ্যে সে কিছুতেই প্রবেশ করতে পারে না। ইসলামের কোন নির্দেশ কোন বিধানই তার ওপর কার্যকরী হবে না। মুসলমানদের জামায়াতে সে কিছুতেই শরীকদার হতে পারবে না। কারণ এ ব্যবস্থাপনায়

তার পক্ষে খাপ খাওয়ানো সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। এর আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থা সে কিছুতেই পালন করতে পারে না।

মুনাফেকীর ভয়

যারা ঈমানের দাওয়াতকে খোলাখুলি প্রত্যাখ্যান করে, তাদের ব্যাপার তো সুস্পষ্ট। তাদের এবং মুসলমানদের মধ্যে কুফর ও ঈমানের অতি সুস্পষ্ট ও দুর্লংঘ্য সীমারেখা বিদ্যমান। সেই সীমা ডিঙিয়ে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে তারা কখনো অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। কিন্তু যারা মু'মিন না হয়েও ঈমানের দাবী করে মুসলমানদের দলে ঢুকে পড়েছে, যাদের অন্তরে সন্দেহের ব্যাধি লুকিয়ে রয়েছে কিংবা যাদের বিশ্বাস অতি দুর্বল তাদের অস্তিত্ব ইসলামী ব্যবস্থার পক্ষে অতীব মারাত্মক। কারণ তারা ইসলামের সীমার মধ্যে দাখিল হলেও ইসলামী চরিত্র ও ইসলামী জীবনধারা গ্রহণ করেনি। তারা ইসলামী আইনের অনুসরণ এবং আল্লাহর বিধানের সংরক্ষণ করেনি; বরং তারা নিজেদের বিকৃত চরিত্র ও আচরণ দ্বারা মুসলমানদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিকৃত করে দিচ্ছে, নিজেদের মানসিক ব্যাধির সাহায্যে মুসলমানদের জাতীয়তা রাজনৈতিক রাস্তার শিকড় উপড়ে ফেলছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ভেতর ও বাইরে থেকে নানা ফিতনা সৃষ্টি করে। কুরআন মজীদে এ ধরনের লোকদেরকেই মুনাফেক বা কপট বিশ্বাসী বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এদের অনুপ্রবেশের ফলে মুসলিম সমাজে যেসব ফেতনার সৃষ্টি হয়ে থাকে, সেগুলোও সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ শ্রেণীর লোকদের পরিচয় এই যে, এরা ঈমানের দাবী করে বটে, কিন্তু আদতে ঈমানদার নয়:

"যারা বলে যে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ তারা ঈমানদার নয়।" *–(সূরা আল বাকারা : ৮)*

তারা মুসলমানদের সাথে মুসলমানের মতো কথা বলে আর কাফেরদের সাথে কাফেরদের মতো।

“তাদের কেউ কেউ সদকার বিলি-বন্টনে তোমার প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করে: তাদেরকে যদি সদকার অংশ দেয়া হয় তো খুশী হয়ে যায় আর না দেয়া হলেই বিগড়ে যায়।“ -- *(সূরা আত তাওবা: ৫৮)*

এভাবে যখন ইসলাম ও মুসলমানের ওপর বিপদ ঘনিয়ে আসে তখন তারা যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বসে; কারণ ইসলামের প্রতি তাদের আদতেই কোনো ভালোবাসা নেই বিধায় তার জন্যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতেই তারা সম্মত নয় আর সে ত্যাগ স্বীকারে কোন প্রতিফল পাওয়া যাবে এমন প্রত্যাশাও তারা করে না। এমন কি ইসলামের সত্যতায়ই তাদের বিশ্বাস নেই: এ. কারণেই তার স্বার্থে জীবন দিতে তারা প্রস্তুত নয়। তারা নানাভাবে যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার এবং নিজেদের জীবন বাঁচার চেষ্টা করে। আর কখনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও নিতান্ত অপ্রসন্নচিত্তেই করে। ফলে তাদের এ অংশগ্রহণ মুসলমানদের জন্যে শক্তির পরিবর্তে দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের এ অবস্থাটিই সূরায়ে আলে ইমরান, আন নিসা, সূরায়ে আত তাওবা এবং সূরা আহযাব-এ সবিস্তারে বিবৃত করা হয়েছে।

এদের সবচেয়ে মারাত্মক পরিচয় হলো এই যে, মুসলমানদের ওপর যখন বিপদের ঘনঘটা নেমে আসে, তখন এরা কাফেরদের পক্ষে গিয়ে যোগদান করে। তাদেরকে মুসলমানদের ভেতরকার খবর সরবরাহ করে। তাদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে। মুসলমানদের বিপদ দেখে খুশী হয়। নিজ কওমের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে কাফেরদের কাছ থেকে স্বার্থ ও মর্যাদা লাভ করে। প্রতিটি ইসলামের বিরোধী ফেতনায় তারা সামনে এগিয়ে অংশ গ্রহণ করে। এবং মুসলমানদের দলে অনৈক্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্যে ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। এ পরিচয়টিও আলে ইমরান, নিসা, তাওবা, আহযাব এবং মুনাফিকুন- এ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

এর থেকে ভালো মতোই আন্দাজ করা চলে যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার জন্যে খাঁটি, নির্ভুল ও যথার্থ ঈমান একান্ত আবশ্যক। ঈমানের দুর্বলতা এ ব্যবস্থার মূল শিকড় থেকে নিয়ে ডালপালা পর্যন্ত সবটাকেই অন্তসারশূন্য করে দেয়। এর মারাত্মক প্রভাব থেকে সভ্যতা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, সামাজিকতা, রাজনীতি কোন কিছুই রক্ষা পেতে পারে না।

চিত্তবিনোদন ও ইসলামী সংস্কৃতি

ইসলামী আদর্শানুসারী জীবন একটি বিশেষ পদ্ধতিতে চালিত হয়। তাতে যেমন বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনের অবকাশ নেই, তেমনি নেই সংকোচন ও মাত্রা হ্রাসকরণের সুযোগ। শরী'আতের দৃষ্টিতে যা বৈধ, তাকে অবৈধ কিংবা কোন অবৈধকে বৈধ করার ক্ষমতা বা অধিকার কাউকেই দেয়া হয়নি। ইসলামী সংস্কৃতিময় জীবন ভারসাম্যপূর্ণ। কোন দিকের বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন দ্বারা সে ভারসাম্য বিনষ্ট করা সম্ভব নয়।

ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে উদ্দেশ্যহীন জীবন মানুষের গ্রহণযোগ্য নয়। বরং সুনির্দিষ্ট আইন-বিধি ও ব্যবস্থাধীন লক্ষ্যানুগ জীবনই ইসলামের কাম্য। যে জীবনের লক্ষ্য বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্র সন্তোষ লাভ, ইসলামের দৃষ্টিতে তা-ই সফল জীবন। সে জীবনে খোদার নাফরমানী বা সীমালংঘনের একবিন্দু স্থান নেই। বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতিময় জীবন স্থবির, নিষ্ক্রিয় বা অথর্ব নয়। প্রকৃতপক্ষে এই জীবনই সক্রিয়, গতিশীল ও কর্ম-কোলাহলে মুখরিত। এ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত হয়। এরূপ জীবন যাপন যে বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই। এ জীবন বৈরাগ্যবাদী নয়; কেননা দুনিয়াত্যাগী জীবন কোন মাপকাঠিতেই মানবীয় নয়; দুনিয়ার দ্রব্য-সামগ্রী ও উপাদান-উপকরণ যথাযথভাবে ভোগ-ব্যবহার এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সব কিছু কুরবানী করাই ইসলামের লক্ষ্য। সাংস্কৃতিক জীবনের স্বল্প ও সীমিত মুহূর্তগুলোকে অর্থহীন আরাম-আয়েস বা প্রবৃত্তির দাসত্বে অতিবাহিত করা জীবনের চরম অবমাননা এবং এটাই হচ্ছে জীবনের চরম ব্যর্থতার নামান্তর মাত্র। ইসলামে

হালাল খাদ্য গ্রহণে, হালাল পানীয় পান করায় এবং হালাল পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে কোন বাধা-নিষেধ আরোপিত হয়নি। এখানে নিষিদ্ধ হল মাত্রাতিরিক্ততা, অপব্যয়-অপচয়, অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ। কেননা এর ফলে মানব মনে অসুস্থ ভাবধারা ছাড়াও পরিবার ও সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া অবধারিত। এক কথায়, ইসলাম মানুষের বৈষয়িক জীবনের নানাবিধ প্রয়োজন উত্তম পন্থায় ও যথার্থ ভারসাম্য সহকারে পরিপূরণে ইচ্ছুক। কিন্তু জীবনে একবিন্দু বিপর্যয় সূচিত হোক তা বরদাশত করতে ইসলাম প্রস্তুত নয়।

মানুষ ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিটি মুহূর্ত উজ্জীবিত থাকুক, ইসলাম এটাই দেখতে চায়। তার জীবনের একটা মুহূর্তও উদ্দেশ্যহীন কাজে অপচয় হোক, তা ইসলামের কাম্য নয় আদৌ। কিন্তু সেই সঙ্গে এও সত্য যে, নিরবচ্ছিন্ন কর্মব্যস্ততা মানুষের জীবনের সব রস নিঃশেষে শুষে নিয়ে সেখানে সৃষ্টি করে রূঢ়তা ও রুক্ষতা। তাই চিত্তবিনোদন প্রতিটি মানুষের জীবনে অন্তঃসলিলা ফরুধারার মতো অপরিহার্য। কাজের মাঝে চিত্তবিনোদনের সুযোগ-সুবিধা না থাকলে জীবনটাই একটা দুর্বহ বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে অতি স্বাভাবিকভাবেই। তখন জীবনের সব মাধুর্য, হাস্য-রস, আনন্দ-স্ফূর্তি তেলহীন প্রদীপের মতই নিম্নশেষ হয়ে যায় অনিবার্য পরিণতিতে। তাছাড়া কর্মের গভীর চিন্তায় নিরন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে থাকলে কর্মশক্তির অবক্ষয় অবশ্যভাবী। তাই বাস্তব জীবনের দুর্বহ বোঝা সঠিকভাবে বহন করে চলার জন্যে মনকে সব সময় সতেজ, সক্রিয় ও উদ্যমশীল রাখা আবশ্যক। আর তার জন্যে আনন্দ স্ফূর্তি ও চিত্তবিনোদনের নানা উপার ও মাধ্যম অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত। আনন্দ-স্ফূর্তি ও চিত্তবিনোদন ব্যবস্থার দরুন মানব মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করা সম্ভবপর। এর ফলে জীবনের প্রতি জাগে অপরিসীম কৌতূহল, মমত্ববোধ এবং তদ্দরুন মানুষ স্বীয় দায়িত্ব পালনে বিশেষ উদ্যমশীল হয়ে উঠতে পারে কিংবা অন্তত অল্প সময়ের জন্যে হলেও জীবনের নানাবিধ দুঃখ চিন্তা ও মর্মবেদনা থেকে সে নিষ্কৃতি পেতে পারে, মনের দুঃসহ বেদনা অনেকখানি হালকা করতেও সক্ষম হয়। এতে সন্দেহ নেই যে, মানব জীবন নানা দুঃখ-বেদনা ও আনন্দের সমষ্টি মাত্র। ঘটনা-পরম্পরার

ঘাত-প্রতিঘাত মানুষকে কখনো দেয় দুঃখ আর কখনো দেয় আনন্দ। এই হচ্ছে জীবনের বাস্তবতা। একারণে দুঃখ ও দুশ্চিন্তার দুর্বহ ভারটা যদি মানুষের মনের ওপর বেশীক্ষণ চেপে বসে থাকে, তাহলে তা মনস্তত্ত্ব নৈতিকতা ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে তার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হতে পারে। পক্ষান্তরে আনন্দের এক পশলা হালকা বারিপাত লোকদের মানস-প্রান্তরে রচনা করতে পারে ফুল ও ফল-ভরা গুল-বাগিচা। বস্তুত হর্ষোৎফুল্ল মনের পক্ষে অধিক কর্মক্ষম হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। আর তারই জন্যে মানুষের জীবনে চিত্তবিনোদনের সামগ্রী যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অতএব চিত্তবিনোদনও সংস্কৃতিরই এক অপরিহার্য দিক।

ইসলাম মূলগতভাবে চিত্তবিনোদনের প্রয়োজনীয়ভাকে অস্বীকার করে নি; বরং নির্দোষ হাস্যরস, আনন্দ-স্ফূর্তি ও কৌতুককে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে; কিন্তু এক্ষেত্রেও ভারসাম্যকে উপেক্ষা করতে ইসলাম রাজী হয়নি। মানুষ কেবল আনন্দ-স্ফূর্তিতে মশগুল হয়ে থাকবে এবং ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সর্ব প্রকারের চিত্তবিনোদনে জীবনের মহামূল্য সময় অতিবাহিত করবে, ইসলাম তা মোটেই পসন্দ করেনি। কেননা তার ফলে মানুষ আল্লাহ্র যিক্র থেকে পাফিল হয়ে যেতে পারে। আর আল্লাহর যিক্র থেকে গাফিল হয়ে যাওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের পক্ষে নৈতিক ও মানবিক উভয় দিকের চরম বিপর্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যাবে, চিত্তবিনোদনের ব্যাপারটা বহুলাংশেই আপেক্ষিক। কার চিত্ত কিসে বিনোদন করবে আর কিসে হবে দুঃখ-ভারাক্রান্ত সে ব্যাপারে কোন স্থায়ী মানদণ্ড নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আসল লক্ষ্য হল চিত্তের বিনোদন। এখানে আনুষ্ঠানিকতার গুরুত্ব আছে; কিন্তু তা মুখ্য নয়, গৌণ। চিত্তবিনোদনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য; কিন্তু তার জন্যে ইদানিং যে সব অনুষ্ঠানের আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে সাধারণভাবে তা নিশ্চয়ই অপরিহার্য নয়। কেননা চিত্তের বিনোদনের জন্যে তা-ই নয় একমাত্র উপায়। এ ধরনের অনুষ্ঠান ছাড়াও চিত্তের বিনোদন সম্ভব। ইসলাম এ দৃষ্টিতেই চিত্তবিনোদনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে অনুষ্ঠান হিসেবে কেবল তা-ই সমর্থন করেছে যা নির্দোষ-যার পরিণাম ভাল ছাড়া মন্দ নয়, যাতে করে মানুষের নৈতিকতার পতন ঘটার পরিবর্তে উন্নতি সাধিত হয়, যার দ্বারা মনুষ্যত্বের সুমহান

মর্যাদা রক্ষা পায়, যার ফলে মানুষ তার উন্নত মর্যাদা থেকে পশুর স্তরে নেমে যায় না। এ ধরনের যা কিছু অনুষ্ঠান ও উপকরণ হতে পারে, তা-ই ইসলামে সমর্থিত এবং মানুষের পক্ষেও তা-ই গ্রহণীয়। পক্ষান্তরে যা কিছু এর বিপরীত তাকে বর্জন করাই ইসলামের দৃষ্টিতে বাঞ্ছনীয় এবং মানুষের পক্ষেও তা বর্জন করা কর্তব্য। এই দৃষ্টিতে বর্তমানে চিত্তবিনোদন সামগ্রী বা মাধ্যম হিসেবে গৃহীত কতিপয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে খানিকটা বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

সিনেমা, টেলিভিশন ও নাট্যাভিনয়

বর্তমান কালে সিনেমা বা চলচ্চিত্রকে এক সস্তা চিত্তবিনোদন মাধ্যম রূপে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সিনেমায় বর্তমানে অশ্লীল, নির্লজ্জ ও নৈতিকতা-বিবর্জিত দৃশ্যাবলীর প্রদর্শনীর এক চরম অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলছে। তাতে যে কাহিনী বা গল্প চিত্রায়িত হয়, তা অবৈধ ভালবাসা ও রোমান্টিক ঘটনা-পরম্পরার আবর্তনে উদ্বেলিত। তা দর্শকদের, বিশেষত তরুণ-তরুণীদের মন-মগজ ও চরিত্রের ওপর অত্যন্ত খারাব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। রূপালী পর্দায় যা কিছু দেখানো হয়, হুবহু তারই প্রতিফলন ঘটে দর্শকদের চরিত্রে। যা থাকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, তাকেই বাস্তবে রূপদান করার জন্যে পাগল-পারা হয়ে ওঠে দর্শকবৃন্দ। এ ধরনের দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করায় দর্শকদের মধ্যে তাৎক্ষণিক যৌন উন্মাদনা ও দুর্দমনীয় আবেগ-উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হওয়াও কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। এ ধরনের কাহিনীকে চিত্রায়িত করার জন্যে প্রথমেই নারী-পুরুষ তথা উদ্ভিন্ন-যৌবন যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা, নগ্নতা-উচ্ছৃংখলতা, নারী-পুরুষের মধ্যে অবৈধ, অন্যায় ও অসভ্য সম্পর্ক স্থাপন, নির্লজ্জ অঙ্গভঙ্গি এবং তার পরিণামে পাশবিক আচার-আচরণে অভ্যস্ত হওয়া অবধারিত। এক্ষেত্রে নির্লজ্জতা ও পাশবিকতার মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি করার দাবি তীব্র হতেও তীব্রতর হয়ে ওঠে। আর এ দাবি পূরণ নাহলে সিনেমার দর্শকদের সংখ্যাও কমে যায়। দর্শকদের যৌন পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্যে সিনেমায়, বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশে নায়ক-নায়িকার অত্যন্ত অশ্লীল দৃশ্যের অবতারণা করা হয়। কিন্তু এসব অশ্লীল, গর্হিত ক্রিয়া কর্ম ইসলাম আদৌ সমর্থন

করেনা, এমনকি এসব অশ্লীলতার ধারে-কাছে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে; শুধু তা-ই নয়, কোনোক সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও রুচিশীল মানুষই তা বরদাশত করতে পারেনা। এগুলো যে মনুষ্যত্বের চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননা, তা কি বলবার অপেক্ষা রাখে?

ছবি অঙ্কন ও প্রতিকৃতি নির্মাণ

প্রাণীর ছবি অঙ্কন বা প্রতিকৃতি (Statue) নির্মাণ ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূলের হাদীসে এসম্পর্কে কঠিন নিষেধবাণী উচ্চারিত হয়েছে। নিছক চিত্তবিনোদনের খাতিরে এ ধরনের কাজ করা কিছুতেই উচিত নয়। অবশ্য নিষ্প্রাণ জিনিসের ছবি তোলা বা তার প্রতিমূর্তি নির্মাণ করা নিষিদ্ধ নয়। তাতে দোষেরও কিছু নেই। এরূপ কাজে বরং ড্রয়িং ও প্রকৌশল বিদ্যার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে। ইসলামে প্রতিমূর্তি নির্মাণ – বর্তমানে যাকে বলা হয় ভাস্কর্য-শুরু থেকেই নিষিদ্ধ এবং অন্যায় বলে চিহ্নিত। নবী ও রাসূলগণ এরূপ কাজের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। মুসলিম জাতি প্রথম দিন থেকেই মূর্তিভাঙা জাতি নামে পরিচিত। কাজেই প্রতিমূর্তি নির্মাণ কোন মুসলমানের কাজ হতে পারেনা, আধুনিক শিল্পকলার দৃষ্টিতে তার যত বেশী মর্যাদাই স্বীকার করা হোক না-কেন। একটি মূর্তি-পূজক জাতির পক্ষেই এটা শোভা পায়। ইসলামে মূর্তি নির্মাণ ও মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ এজন্যে যে, এটা শিরকের উৎস আর শিরক ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শ। যে সমাজে শিরক অনুষ্ঠিত হয়, সে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে সংক্রামক ব্যধির মতোই এই রোগ সংক্রমিত হয় এবং সকলকে মুশরিক বানিয়ে ছাড়ে। এই কারণ অল্প সময়ের তরে বা শিল্প-কলার খাতিরেও এই কাজকে বরদাশত করা যেতে পারেনা। ইসলামী সমাজের আদর্শ পুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর জাতির মূর্তি খামারের সব ক'টি মূর্তিই চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন।

হযরত মুহাম্মাদ (স) মক্কা বিজয়ের পর কা'বা ঘরে অবস্থিত তিনশ' ষাটটি মূর্তিকে বাইরে নিক্ষেপ করে ঘোষণা করেছিলেন : "সত্য এসেছে, মিথ্যা ও অসত্য নির্মূল ও বিলীন হয়ে গেছে।"

তাই মূর্তি নির্মাণের কাজ তাওহীদ বিশ্বাসীদের পক্ষে কোনরূপ গৌরবজনক কাজ হতে পারে না, কাল বিবর্তনে তার নাম যাই হোক-না কেন। প্রকৃতপক্ষে একাজ মানবতার ললাটে কলঙ্ক টিকামাত্র।

আধুনিক Finearts (ললিতকলা) ও Sculpture (ভাস্কর্যবিদ্যা)-এ এইসব পঙ্কিল ভাবধারা পুরোমাত্রায় স্থান পেয়েছে। আসলে মূর্তি-পূজার প্রাচীনতম ভাবধারা আধুনিক যুগে ভাস্কর্য শিল্পের ছদ্মাবরণে শিরককেই সংস্থাপিত করতে চাচ্ছে। শিল্পকে এই শিরকী ভাবধারা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করা ইসলামী সংস্কৃতিবানদের কর্তব্য।

তাস, দাবাখেলা ও জুয়া

বর্তমানকালে তাস, দাবা খেলা ও জুয়ায় মত্ত হয়েও বহু মানুষ অবসর বিনোদন করে এবং এসব খেলার মাধ্যমে আনন্দ লাভ করে। অনেকে এসব খেলায় মেতে গিয়ে আল্লাহ্র স্মরণ, পরকালের চেতনা ও শরী'আতের অনুসরণ, ঘর-সংসার ও যাবতীয় দায়-দায়িত্বের কথা বেমালুম ভুলে থাকতে চাইছে। তাদের সামনে জীবনের কোন বৃহত্তর বা মহত্তর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকতে পারেনা। কোন প্রকার আনন্দ-স্ফূর্তিতে মশগুল হয়ে জীবনের মহামূল্য মুহূর্তগুলো কাটিয়ে দেয়ার এই প্রয়াস মানব সমাজের জন্যে অত্যন্ত মারাত্মক। তাস ও দাবা খেলায় চিন্তাশক্তি সূক্ষ্মতা লাভ করে বলে দাবি করা হয়; কিন্তু একথা কোন নির্বোধ ব্যক্তির পক্ষেই বিশ্বাস করা সম্ভব। এতে বরং জীবনের মহামূল্য সময়ের অকারণ অপচয় ঘটে। যে জাতির বেশীরভাগ লোক এ রোগে আক্রান্ত সে জাতি ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ও সমস্যা-সংকুল এই জগতে কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনা। প্রতিযোগিতায় পরাজিত হওয়া ও শেষ পর্যন্ত বিশ্ব-পটভূমি থেকে চিরবিদায় গ্রহণই হয় সে জাতির ললাট-লিখন। ইদানীং লটারীসহ নানা ধরনের জুয়াকে এদেশে সরকারীভাবেই উৎসাহিত করা হচ্ছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জুয়া খেলা হচ্ছে অন্যায়ভাবে অর্থলুণ্ঠন কিংবা অসতর্কতার মধ্যে নিজের সর্বস্ব খুইয়ে সর্বহারা হওয়ার একটা কার্যকর মাধ্যম। ইসলামে এ কারণেই সর্বপ্রকার জুয়া নিষিদ্ধ। বিশাল মোগল সাম্রাজ্য ও

অযোধ্যার মুসলিম রাজত্বের নির্মম পতন ঘটার মূলে এই জুয়া খেলা যে প্রধান কারণ তা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য।

নাচ-গান ও বাদ্য-যন্ত্র

নৃত্য-সঙ্গীত ও বাদ্য-যন্ত্রের ব্যবহার বর্তমান সমাজে চিত্তবিনোদনের আকর্ষণীয় উপকরণরূপে স্বীকৃত ও গৃহীত। স্বতন্ত্রভাবে নাচ ও গানের বিশ্লেষণ করা হলে এর আসল রূপটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। গান মিষ্টি কণ্ঠের সুমার্জিত সুর-ঝঙ্কার। তার স্বভাবিক আকর্ষণ তার সুরের ও তালের মধ্যে নিহিত। বিশেষ মানে ও ভঙ্গিতে কণ্ঠধ্বনির উত্থান-পতন লয় তথা ছন্দই হচ্ছে গান। শ্রোতৃবৃন্দ এ সুর-মূর্ছনায় মুগ্ধ-বিমোহিত হয়ে যায়। গানের এ সুর-তরঙ্গে থাকে এক প্রকারের মাদকতা। শ্রোতাকে তা মাতাল করে দেয়। অনেকে আবার গানের সুরেই সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত নয়। গান যার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে তার অবয়বের প্রতিই শ্রোতাদের আকর্ষণ সর্বাধিক। কণ্ঠস্বর ও অবয়ব উভয়ই যদি মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষক হয়, তাহলেই সোনায় সোহাগা। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে এই দুটিই মানুষ ও মনুষ্যত্বের জন্য বিষের মতো সংহারক। বিষ দেহকে হত্যা করে, জীবনের অবসান ঘটায় আর নাচ মনুষ্যত্বকে করে পর্যুদস্ত। কেননা শুধু হাত-পা নাড়ানোই নৃত্য নয়। নাচের মুদ্রা প্রয়োগের সাথে সাথে দেহ যখন কথা কয়, তখনই নাচ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এ সমস্ত অশ্লীল অঙ্গ-ভঙ্গি দেখে দর্শকবৃন্দ পাগল হয়ে ওঠে আর এই অবস্থাটাই ইসলামের দৃষ্টিতে বর্জনীয়। কেননা এর পরবর্তী পর্যায়ই হচ্ছে যিনা- ব্যভিচার। এতে যে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে তা নিঃসন্দেহ; কিন্তু সে সংস্কৃতি পশুপালের, মানুষকূলের নয়। যুবক-যুবতীর যুগল বা দলবদ্ধ নৃত্য যৌন-কাতর চিত্তেরই বিনোদন করে। যে চিত্তে আল্লাহর যিকির নিহিত, তার কাছে এ বিনোদন শুধু বিরক্তিকরই নয়, অসহ্যও বটে।

নৃত্য ও সঙ্গীতের এ অনুষ্ঠানের উৎপত্তি পৌত্তলিকদের দেব-মন্দিরে পূজার আরতি দানের আত্মনিবেদনে। তা যখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রূপে মঞ্চে উপস্থাপিত হয়, তখন শ্রোতৃবৃন্দই হয় তার দেবতা এবং গান ও নৃত্যের মাধ্যমে যুবতী নারী শিল্পী তাদের নিকট করে আত্মনিবেদন। বিদেশী ও বিধর্মীদের প্রায় দু'শ বছরের গোলামীর যুগে এসব জিনিস মুসলিম সমাজে-বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে। ব্যক্তি চরিত্র ও আদর্শবাদের চরম বিপর্যয়ই যে এর একমাত্র কারণ, তাতে সন্দেহ নেই।

নারী কন্ঠের সুরেলা ঝংকার পুরুষের মাঝে যৌন স্পৃহার সৃষ্টি করে, সে কথা সবাই জানে-সবাই বুঝে। এ জন্যই নবী করীম (স) সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন:

'সঙ্গীত ব্যভিচারের তুলনায় অধিক মারাত্মক'।

কেননা গান-বাদ্য-নৃত্যের মাদকতা মানুষের মন-মগজকে সহজেই বিভ্রান্ত করে। তাতে জাগিয়ে দেয় এক ধরনের আবেশ-আসক্তি। যার অনিবার্য পরিণতি হল নৈতিক বন্ধনের শিথিলতা আর তারই পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন আকাংক্ষার পরিতৃপ্তি। কুরআন মজীদে সঙ্গীত-গান-বাজনা-নৃত্যকে لَهْوَ الحديث বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ হল এমন কথা, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে, দায়িত্ব ও কর্তব্যে তাকে গাফিল ও অসর্তক বানিয়ে দেয়। নিরপেক্ষ ও অনাসক্ত মন-মানসিকতা নিয়ে যারা এ জিনিসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবেন তারাই কুরআনের এ ঘোষণার যথার্থতা ও বাস্তবতা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। নাচ-গানের মাধ্যমে দর্শকদের ন্যায়-অন্যায় বোধের বিলোপ ঘটে, সুস্থ অনুভূতিসম্পন্ন কোন মানুষই তা অস্বীকার করতে পারেনা। তাই এসব অনুষ্ঠান সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের ঘোষণাবলীর সত্যতা ও যৌক্তিকতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আসলে এগুলো হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব, রুচিরোধ ও নৈতিকতা ধ্বংস করার এক সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র। সত্যিকার ঈমান ও বলিষ্ঠ ইসলামী চরিত্র দিয়েই এ ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন-ভিন্ন করা যেতে পারে, অন্য কিছু দিয়ে নয়।

মদ্যপান

মদ পান কুরআনের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট হারাম এবং তা মারাত্মক অপরাধ-কবীরা গুনাহ। কিন্তু চরিত্রহীন লোকেরা নিছক চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে সুরা পান করে থাকে। এর প্রতিক্রিয়ায় তাদের মন-মগজে গুনাহর অনুভূতিটুকুও জাগেনা। বস্তুত মদ হল সব রকমের অশ্লীলতা, চরিত্রহীনতা ও অপরাধপ্রবণতার মৌল উৎস। শরী'আতের দৃষ্টিতে তা পান করা, পান করানো, তৈরী করা এবং বিক্রয় ও পরিবেশন করা অকাট্যভাবে হারাম। কেননা তা পানের ফলে পানকারীর জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-শক্তি সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়। ফলে জাতির চরিত্র, মূল্যবোধ ও অর্থনীতির মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। অনেকে মদকে একটা সাধারণ পানীয়ই মনে করে। এজন্যে এব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকে। এর মারাত্মক পরিণতির কথা তারা চিন্তা ও বিবেচনা করতেই প্রস্তুত নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মদ একটা পানীয় বা নিছক চিত্তবিনোদন উপকরণ মাত্রই নয়। আসলে মদ একটা সংস্কৃতি, একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার ভিত্তি। এমন কি, তা একটা জীবন পদ্ধতিও এবং তা কোনক্রমেই ইসলামী সংস্কৃতি, ইসলামী সভ্যতা ও ইসলামী জীবন পদ্ধতির মধ্যে স্থান লাভ করতে পারেনা। মদ পানের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে ন্যায়-অন্যায় বোধের বিলুপ্তি, নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন এবং সঙ্গে জড়িত থাকবে অপরাধপ্রবণতা, বিশেষত নরহত্যা বা রক্তপাত। তার ফলে গোটা সমাজ ও জাতিই চরম ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়াতে বাধ্য। পবিত্র কুরআন মদের সবগুলো প্রকরণকে একত্রে 'শয়তানের কাজ' আখ্যায়িত করে চিরতরে হারাম করে দিয়েছে।

বস্তুত মনের স্বস্তি-প্রশান্তি-স্থিতি ও পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতাই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা। আল্লাহ্, রাসূল ও পরকালের প্রতি অকৃত্রিম ও ঐকান্তিক বিশ্বাস এবং তদভিত্তিক ও তদনুকূল অনুষ্ঠানাদিই তার চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যম। ইসলামী অনুষ্ঠানাদি মানুষকে মূর্খতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি দেয়। তাদের অন্তরে জাগিয়ে তোলে আল্লাহভীতি, পরকালের জবাবদিহি এবং জীবনের প্রতিপদে, প্রতি ক্ষেত্রে রাসূলের অনুসরণের সুদৃঢ় ভাবধারা।

পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে সংস্কৃতি

কোনো জাতির বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার বিশেষ গুণান্বিত আঙ্গিকের পরিশীলিত ব্যবহারিক বহিঃপ্রকাশকে সংস্কৃতি বলা হয়।

ডিউই বলেন: Culture means at least something cultivated, something repened. It is opposed to the raw and crude. অর্থাৎ সংস্কৃতি বলতে বুঝায় এমন কিছু যার অনুশীলন করা হয়েছে, যা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এ হচ্ছে অপরিণত ও অমার্জিতের পরিপন্থী।

টেইলর বলেন: Culture is the complex-whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom and any other capabilities and habits acquired by men as a member of society.

অর্থাৎ সংস্কৃতি হল সমাজস্থ মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, কথা, নীতি-নিয়ম, সংস্কার ও অন্যান্য বিষয়ে দক্ষতার জটিল সমাবেশ।

ডিউক বলেন: It is cultivated with respect to appreciation of ideas and art and breed human interest. অর্থাৎ এ হল। ধারণা ও কলার মূল্য নির্ধারণ ও মানবীয় অনুরাগ জাগ্রত করার অনুশীলন।

সংস্কৃতির মূল্যায়ন

মানুষের পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের মধ্যেই নিহিত আছে মানব জীবনের পরম কল্যাণ। মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে যখন কামনা-বাসনা, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি ইত্যাদি নিম্নতর বৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করে, তখনই তার আত্মবিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি মানব জীবনের পরম কল্যাণ লাভের পক্ষে সহায়ক। যে ব্যক্তি সংস্কৃতিবান সে তার প্রকৃতি বা স্বভাবকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্যে যত্নবান হয়। জ্ঞানের অধিকারী হওয়া বা সুন্দর গুণের অধিকারী হওয়াই সংস্কৃতি নয়; সত্য,

মহান ও সুন্দরের প্রতি যে ব্যক্তি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ অর্জন করেছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতিবান ব্যক্তি। প্রকৃতি ও মানুষের জীবনে যা কিছু সুন্দর, তার প্রকৃত তাৎপর্য বা মূল্য উপলব্ধি করতে তিনিই সক্ষম। কাজেই পার্থিব জগতের মাপকাঠিতে তিনি যদি দীন ও নিঃস্বও হন, তবু প্রকৃতপক্ষে তিনি এক মহান সম্পদের, এক অতুল বৈভবের অধিকারী।

বস্তুত জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবশ্য পালনীয় মূল্যবোধের সৃষ্টি ও মূল্যাবধারণের প্রচেষ্টা থেকেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোর উৎপত্তি ঘটে থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিকতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কীয় মূল্যগুলোর সমন্বয় থেকেই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর উদ্ভব হয়। অবশ্য সমাজ ও সমাজ-আদর্শ ভেদে এই মূল্যেরও যে পার্থক্য ঘটে, সংস্কৃতির মূল্যায়নে একথা স্পষ্টভাবেই মনে রাখতে হবে।

সংস্কৃতির সামাজিক মূল্যায়নে মানুষ ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেকে মানুষের তুলনায় সমাজকেই বড় করে দেখেন। কিন্তু এ সত্য কোনক্রমেই ভুলে যাওয়া চলেনা যে, মানুষ নিয়েই সমাজ, মানুষকে বাদ দিয়ে সমাজের কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই। মানুষের প্রকৃতিকে উন্নত করাই সমাজের লক্ষ্য। ম্যাকেজী (Mackenzie) Culture বলতে এই ব্যষ্টিগত ব্যক্তিত্বের (Individual Personality) অনুশীলনকেই বুঝেছেন। শিক্ষার ব্যাপকতর এবং সংকীর্ণতর দু'ধরনের তাৎপর্য আছে। ব্যাপকতর অর্থে শিক্ষা বলতে যা বুঝায়, তা-ই হল সংস্কৃতি।

ম্যাকেঞ্জী বলেন: সংকীর্ণ অর্থে এ হল জন-সমাজের জীবনে দীক্ষা লাভ করা আর ব্যাপকতর অর্থে এ হল মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে উন্নত করা, যার জন্য সমাজ জীবন হল একটি উপায় মাত্র।

বস্তুত সংস্কৃতি এমন একটা কর্মোপযোগী সত্য যা মানুষের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট সাহায্য করে। সংস্কৃতি মানুষকে এক আপেক্ষিক দৈহিক প্রশস্ততা দান করে। তার ফলে মানুষের ব্যক্তিত্বে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুভূতি জাগে। ব্যক্তিত্বের একটা

সাম্প্রসারণতা-যাতে রয়েছে চাঞ্চল্য ও গতিশীলতা-মানুষকে এমন অবস্থায় সাহায্য করে, যখন নিছক একটা রক্ত-মাংসের দেহ কোন কাজেই আসেনা।

সংস্কৃতি সমাজবদ্ধ মানুষের ফসল। মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা ও কর্মশক্তিকে তা ব্যাপক, গভীর ও প্রশস্ত করে দেয়। তা চিন্তার ক্ষেত্রে এনে দেয় গাম্ভীর্য, শালীনতা ও সুসংবদ্ধতা; দৃষ্টিকে বানিয়ে দেয় উদার, বিশাল ও সুদূরপ্রসারী। অন্যান্য জীবজন্তু এ গুণ-বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত। মানুষের ব্যক্তিগত যোগ্যতা-ক্ষমতা-প্রতিভার সামাজিক ও সামষ্টিক রূপ এবং পারস্পরিক চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তিই হয় এসব অবস্থার উৎসমূল।

সংস্কৃতি ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সুসংগঠিত সমাজ গড়ে তোলে আর সে সমাজগুলোকে এক অন্তহীন জীবন-ধারাবাহিকতা প্রদান করে। সংগঠন ও সুসংবদ্ধ সমাজ-কর্ম হচ্ছে ক্রমিক ও ধারাবাহিক ঐতিহ্যের ফসল আর তা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকে। সংস্কৃতি মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতেও বহু তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত করে। তা মানুষের প্রতি কেবল দয়াই করেনা, সেই সঙ্গে তার ওপর অনেক বড় বড় দায়িত্বও চাপিয়ে দেয়। এসব দায়িত্ব পালনের জন্যে ব্যক্তিকে তার নিজের অনেক স্বাধীনতাও কুরবানী দিতে হয়; সে আত্মস্বার্থ বিসর্জন দেয় নিজের ভিতর থেকে পাওয়া প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আর তারই ফলে সম্পাদিত হতে পারে সামগ্রিক কল্যাণ।

মানুষকে নিয়ম- শৃঙ্খলা, আইন-কানুন ও ঐতিহ্যের প্রতি অবশ্যই সম্মান দেখাতে হয়; নিজের স্বভাব-চরিত্র ও কথাবার্তার ধরন-ধারণ এক বিশেষ ছাঁচে ঢেলে গড়ে নিতে হয়। তাকে এমন অনেক কাজই আঞ্জাম দিতে হয় যা থেকে সে নিজে নয় – পুরোপুরি অন্যরাই ফায়দা লাভ করে আর তাকে তার নিজের প্রয়োজনের জন্যে হতে হয় অন্যের দারস্থ।

মানুষের দূরদৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ শক্তি তার মনের মাঝে অনেক প্রকার কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয়। ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা তাকে করে প্রশমিত-পরিতৃপ্ত।

সংস্কৃতি প্রকৃতপক্ষে মানব আত্মারই পরিতৃপ্তির উপকরণ আর তারই দরুন মানুষ পশুর স্তর থেকে অনেক ঊর্ধে ওঠে এক উন্নত মানের বিশিষ্ট সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করে।

মানবীয় ব্যক্তিত্বের অনেকগুলো দিক। একদিকে সে এক ব্যক্তি, একটা সমাজের অঙ্গ বা অংশ আর সমাজ গড়ে ওঠে মানুষের পারস্পরিক মেলা-মেশা, আদান-প্রদান ও সম্পর্ক-সম্বন্ধের বন্ধনের ফলে। এরূপ একটি পারস্পরিক সহযোগিতা-ভিত্তিক সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা সংরক্ষণের জন্যে দায়ী হয়, অতীতের স্মৃতি তার মনে-মগজে ও হাড়ে-মজ্জায় মিশে একাকার হয়ে থাকে। সে স্মৃতির প্রতি তার হৃদয়ে থাকে অটুট মমতা। কিন্তু সেই সঙ্গে সে ভবিষ্যতকে ভুলে যেতে পারেনা। ভবিষ্যতের উজ্জল আলোই তার মনে আশা-আকাঙ্ক্ষার বিচ্ছুরণ ঘটায়। শ্রমের বন্টন ও ভবিষ্যতের অপরিসীম সম্ভাবনা তার সামনে এমন সব সুযোগ এনে দেয়, যার দরুন সে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, সুর ও ধ্বনি থেকে আনন্দ লাভ করতে ও পরিতৃপ্ত হতে পারে।

মোটকথা, মানুষের জীবনকে বাদ দিয়ে কোন সংস্কৃতির ধারণা করা যায়না আর ধর্ম ও সংস্কৃতি দুটিই জীবন-কেন্দ্রিক। জীবন-নিরপেক্ষ সংস্কৃতি অচিন্তনীয়। অন্যদিকে সমাজ-জীবনকে জড়িয়ে নিয়েই ঘটে সংস্কৃতির বিকাশ ও রূপান্তর। তাই সামাজিক আদর্শ ভিন্ন হলে সমাজ-সংস্কৃতিও ভিন্ন হতে বাধ্য।

সংস্কৃতির পাশ্চাত্য মূল্যায়ন

সংস্কৃতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দর্শন মানবতাবাদী নয়-নয় তা মানুষের জন্যে কল্যাণকর। এ দর্শনে আল্লাহ্র সেরাসৃষ্টি মানব সন্তানের চেয়ে নিষ্প্রাণ প্রস্তরে মূর্তির মূল্য অনেক বেশি। এ ব্যাপারে একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করাই যথেষ্ট। একবার পশ্চিমা পত্র-পত্রিকায় নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে একটি নিষ্পাপ শিশু অথবা গ্রীক ভাস্কর্যের একটি দুর্লভ, অদ্বিতীয়, উন্নত মানের নিদর্শনের কোনটিকে বাঁচানোর জন্যে চেষ্টা করা উচিত এই মর্মে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। পাঠক সাধারণের তরফ থেকে এ প্রশ্নের জবাবে একবাক্যে মানব

শিশুর পরিবর্তে ভাস্কর্যশিল্পের অতুলনীয় নিদর্শনটিকেই বাঁচাবার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছিল। তার মানে এই দাঁড়ায় যে, পাশ্চাত্য সমাজের দৃষ্টিতে মানুষের চাইতেও অধিক প্রিয়, অধিক মূল্যবান এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একটি ভাস্কর্য শিল্প-প্রস্তরনির্মিত একটি নিষ্প্রাণ প্রতিমা। এমনিভাবে নৃত্য, সঙ্গীত ও অভিনয়ের যত অনুষ্ঠানই আজ সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নামে মানবসমাজে প্রচলিত রয়েছে, তার সবক'টিতেই যে মনুষ্যত্বের অপমান-মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটে, তাতে কোনো সন্দেহ আছে কি? বস্তুত মানবতার ধ্বংসই এসবের একমাত্র পরিণতি। আর ইসলামের দৃষ্টিতে যা কিছু মানবতাবিধ্বংসী তথা মানব চরিত্র বিকৃতকারী, তা মানুষের পাশববৃত্তির চরিতার্থতা, চিত্তবিনোদন ও আনন্দ বিধানের যত বড় আয়োজনই হোকনা কেন, তা সংস্কৃতি নামে অভিহিত হওয়ারই যোগ্য নয়। এই ধরনের আচার-অনুষ্ঠানকে ইসলামী সংস্কৃতি নামে অভিহিত করার মতো ধৃষ্টতাও আর কিছু হতে পারে না।

পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক প্রভাব

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুসলিম বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে লক্ষণীয় হচ্ছে ফ্রান্সের মতো একটি দেশ আইন করে হিজাব নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এটি প্রমাণ করে পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন কোন পর্যায়ে যেতে পারে। তারা শালীনতাকে সহ্য করতে পারে না। তারা নগ্নতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে তাদের সংগ্রাম শালীনতার বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মুসলিম বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বিপদজনক সাংস্কৃতির আগ্রাসনের ফলেই মুসলিম দেশের অভ্যন্তরে হু হু করে বিদেশী অর্থে প্রতিপালিত বিশেষ গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিরাট অংশ বিদেশী স্কলারশিপ, পদক, খেতাব, পুরস্কার এবং নগদ অর্থপ্রাপ্তির লোভে লালায়িত হয়ে আত্মবিক্রয় করে বিদেশের গোলামে রূপান্তরিত হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে অবস্থান করে আগ্রাসী শক্তির স্বার্থে তারা নিজেদের মেধা নিয়োজিত করে রেখেছে,

কেননা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটি যুদ্ধ, যা মুসলিম দেশ সমূহের নতুন প্রজন্মের ইসলামী চেতনা বিশ্বাসে চরম আঘাত হানছে।'

ফ্যাশন শো সংস্কৃতি

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে পোশাক প্রদর্শনীর নামে নারী পুরুষ বিভিন্ন অশালীন পোশাকে সজ্জিত হয়ে দর্শকদের সামনে অঙ্গভঙ্গিমা প্রদর্শন করে। সুসজ্জিত মডেল তরুণীদের দর্শনীয় ভঙ্গিমায় নিজেকে প্রদর্শন দর্শকদের মাঝে উন্মত্ততা সৃষ্টি করে। মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমা সমাজের এসব বেহায়াপনার ব্যাপক বিস্তার ঘটছে। এর ফলে মুসলিম সমাজে অবাধ যৌনাচার, হারাম সম্পর্ক, যিনা-ব্যভিচার, সমকামিতার মত ভয়াবহ ক্ষত মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলিমগণের তথাকথিত সভ্যকরণের প্রক্রিয়ায় পশ্চিমা মিডিয়া মুসলিমদের সমাজে এসব অনৈতিক সম্পর্কের বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সংস্কৃতি

বিজ্ঞাপন পণ্য বাজারজাতকরণের একটি মাধ্যম হলেও মুসলিম তাহযীব তমুদ্দন ধ্বংসে এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। প্রায় সকল পণ্যের বিজ্ঞাপনে অপরিহার্যভাবে ব্যবহার হয় মডেল তরুণীরা। এ ব্যাপারটি বর্তমানে প্রায় বিনা চ্যালেঞ্জে মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের মিডিয়াতেও ঢুকে পড়েছে। এর মাধ্যমে তরুণী নারীদেরকে আকর্ষণীয় ভোগ্যপণ্য হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়। এভাবে মুসলিম নারীর হিজাব রীতিমতো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। পর্দাহীনতা, অবাধ যৌনাচার, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইত্যাকার অনৈসলামিক রীতির বিস্তার মূলত নারী বিজ্ঞাপন সংস্কৃতির বিস্তারেরই ফল।

ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা

মহাকাশ, মহাসিন্ধু ও মহাবিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে এমনিতেই ছেড়ে দেন নি। বরং তাদের জীবন শান্তি পূর্ণ ভাবে পরিচালনার জন্য জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রত্যেকটি দিক তথা ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, অর্থনৈতিক জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবন প্রভৃতি জাগতিক বিষয় এবং পারলৌকিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্যা ও সম্ভাবনার সুষ্ঠু সমাধান দিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলামে। এই ইসলাম সমাজ বন্ধন কে অত্যান্ত গুরুত্ব প্রদান করে। ইসলাম যেহেতু মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন ধারা নিয়ন্ত্রণ করে তাই মানব জীবনে চিন্তার বিশ্বাস, প্রত্যয়, আবেগ-অনুভূতি, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, সামাজিকতা, আচরন ও ক্রিয়াকান্ডে পূর্ণাঙ্গ পরিমার্জন পরিশোধন করে আর এ সমস্ত অনুশীলনের নামই ইসলামী সংস্কৃতি। মিশরের প্রখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক হাসান আইয়ুব তার রচিত আল আকায়েদ আল ইসলামী গ্রন্থে বলেনঃ ইসলামী সংস্কৃতি বলতে কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক মানুষের জীবনের চিন্তা- চেতনা, আবেগ-অনুভূতি, অনুরাগ, মূল্যবোধ, ক্রিয়াকান্ড, সৌজন্যমূলক আচরণ, পরিমার্জিত ও পরিশোধিত সৎকর্মশীলতা, উন্নত নৈতিকতা তথা জীবনের সকল কর্মকাণ্ডকে বোঝায়। মানুষের পরিপূর্ণ জীবনধারাই ইসলামী সংস্কৃতির আওতাধীন। বর্তমানে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগ্রাসনে ইসলামী সংস্কৃতি মুসলিম সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। যুবক-তরুণদের মাঝে অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ও অপরাধ প্রবনতা দিন দিন বেড়ে চলছে। আজ এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে হচ্ছে পুরো মুসলিম জাতিকে। আজ পুরো পৃথিবীতে মুসলমানদের উপর চলছে নির্যাতন নিপীড়নের স্টীম রোলার। মুসলিম বিদ্বেষীরা মুসলমানদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও কালচার পৃথিবী থেকে ভুলুন্ঠিত করার অপ্রয়াসে লিপ্ত আছে। যার কারণে মুসলিম প্রধান দেশ গুলোতে বিভিন্ন অজুহাতে হামলা চালানো হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে তিউনেশিয়া থেকে শুরু করে মিশর, সুদান, আফগানিস্তান, ইরাক, ইয়েমেন, লিবিয়া, সিরিয়াতে বিভিন্ন অপপ্রচার চালাচ্ছে। এবং এ সমস্ত দেশ গুলোতে পশ্চিমা বিশ্ব হামলা চালিয়ে

মুসলমানদের যে নিজস্ব ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতা আছে, তা পশ্চিমা বিশ্ব একের পর এক ধ্বংস করে চলেছে।

এই পর্যায়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতির মৌল ভাবধারাকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে কথাটি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইসলামী সংস্কৃতি ও পশ্চিমা সংস্কৃতি

ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এজন্যই তা এক আপোষহীন 'দ্বীন' নামে অভিহিত। তার নির্দিষ্ট সীমা বা পরিমণ্ডলের ভেতর মানুষ নিজ ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারে। ইসলামের নির্ধারিত এ সীমা অপরিবর্তনীয়, চিরন্তন ও শাশ্বত সত্যের ধারক। বিশ্বলোকের চিরন্তন মূল্যমানের উৎস যে খোদায়ী গুণাবলী তা ইসলামের সীমার মধ্যে নিজের অয়ত্তাধীন করে নিতে প্রত্যেক ব্যক্তিই সক্ষম হতে পারে।

ইসলামী বিধানের অধীনে ব্যক্তিগণের মধ্যে এমন শৃংখলা (Discipline) ও নিয়মানুবর্তিতার সৃষ্টি হয়, যার দরুন খোদায়ী গুণাবলীর আনুপাতিক প্রতিফলন হওয়া সম্ভবপর। ইসলামের পরিভাষায় একেই বলা হয় ই'তিদাল-ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা।

সেখানে ব্যক্তিগণের মধ্যে এমন যোগ্যতার উদ্ভব হয়, যার ফলে প্রকৃতি বিজয়ের সুফলকে বিশ্বমানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করা সম্ভবপর হয়। ইসলামের উপস্থাপিত বিশ্বভ্রাতৃত্ব, স্রষ্টার এককত্ব ও অনন্যতা এবং জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতার সুদৃঢ় ধারণা এমন এক একাত্মতা ও অভিন্নতার সৃষ্টি করে যার দরুন মানব সমাজের বাধ্যবাধকতা নিঃশেষে দূরীভূত হয়ে যায়। এই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের জন্যে জীবিত থাকে বিধায় সমস্ত ব্যক্তির জীবন-প্রয়োজন নিজে নিজেই পূর্ণ হতে থাকে।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে- এই জীবনটা কতকগুলো মৌলিক উপাদানের আপতিক বা দুর্ঘটনামূলক সংমিশ্রণে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তার মূলে কোন উদ্দেশ্য নেই; তার লক্ষ্য ও পরিণতি বলতেও কিছু নেই। এসব উপাদানের বিশ্লিষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হওয়ারই নাম মৃত্যু। এই মৃত্যুর পর আর কোন জীবন অকল্পনীয়। জীবন একটা দুর্ঘটনা

মাত্র। তাই দুনিয়ায় নেই কোনো শাশ্বত মূল্যমান-নেই কোনো দায়-দায়িত্ব, কোনো প্রতিশোধ বিধান।

এই চিন্তা দর্শনে ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে যা কল্যাণকর, তা-ই ভালো। অন্য ব্যক্তি বা জাতির জীবন-শিরা যদি তাতে ছিন্ন-ভিন্নও হয়ে যায়, তবু তা ভালোই। পক্ষান্তরে ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে যা-ই ক্ষতিকর, তা-ই মন্দ-তাতে অন্যান্য মানুষের বা জাতিসমূহের যতই কল্যাণ নিহিত থাক না কেন। এক কথায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্পূর্ণত স্বার্থবাদী দর্শনের ওপর ভিত্তিশীল। একারণে দুনিয়ার বিভিন্ন ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে কঠিন দ্বন্দু ও যুদ্ধ-বিগ্রহই তার অনিবার্য পরিণতি। পাশ্চাত্য সমাজে ভাঙন ও বিপর্যয়ই সাধারণ দৃশ্য। সেখানে শাসক ও শাসিত, বিজয়ী ও বিজিত, মালিক ও শ্রমিক এবং শোষক ও শোষিত শ্রেণীগুলোর মধ্যে সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে স্বাভাবিকভাবেই।

বিজিত ও পদানত জাতিসমূহকে সেখানে প্রকৃতি বিজয়ের মূল তত্ত্ব বা রহস্য উন্মোচনে শরীক করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব বিরোধী জনমনে দৃঢ়মূল করে দেয়াই তার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে মানুষ নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারে। এ সীমা ও জীবন-লক্ষ্য শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়; চিরন্তন সত্যের ধারক ও বাহক। অতএব এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই আল্লাহর গুণাবলীকে-যা বিশ্বলোকে স্থায়ী মূল্যমানের উৎস-নিজের মাঝে প্রতিফলিত করে নিতে পারে।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল দর্শন হল, এ জীবন কয়েকটি মৌল উপাদানের উদ্দেশ্যহীন সংমিশ্রণের ফলে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এর কোনো লক্ষ্য নেই-নেই কোনো পরিণতি। এসব মৌল উপাদানের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ারই নাম মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর কিছুই নেই-আছে শুধু অন্তহীন শূণ্যতা।

ইসলামী সংস্কৃতি সমাজের ব্যক্তিদের মাঝে এমন শৃঙ্খলা গড়ে তোলে, যাতে করে ব্যক্তি-চরিত্র ও সমাজ-সংস্থায় আল্লাহ্র ভারসাম্যপূর্ণ গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটতে পারে। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে জীবন যেহেতু একটা আকস্মিক ঘটনা-একটা accident মাত্র,

এজন্যে দুনিয়ায় কোনো স্থায়ী মূল্যমান (Permanent Values) নেই-নেই প্রতিফল দানের বা প্রতিফল পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা।

ইসলামী সংস্কৃতি ব্যক্তিদের মাঝে এমন যোগ্যতা ও প্রতিভা জাগিয়ে দেয়, যার কারণে প্রকৃতি জয়ের ফলাফল সাধারণভাবে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে ব্যবহৃত হতে পারে।

পশ্চিমা সংস্কৃতি-দর্শনে যে কথা ও কাজে ব্যক্তি বা জাতির সুবিধা হয়-তা অপর ব্যক্তি বা জাতির জীবন ধ্বংস করেই হোক না কেন-তা-ই ন্যায়, সত্য, ভালো ও কল্যাণকর। পক্ষান্তরে যে কথা ও কাজে ব্যক্তি বা জাতির অসুবিধা বা স্বার্থহানি হয়, তা-ই অন্যায়-তা-ই পাপ।

ইসলামী সংস্কৃতিতে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, স্রষ্টার একত্ব ও মিল্লাতের অভিন্নতার ভিত্তিতে এক ব্যাপকতর ঐক্য ও সম্মিলিত ভাবধারা গড়ে ওঠে। এর ফলে মানব সমাজ থেকে সবরকমের জোর-জবরদস্তি, স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, জুলম-শোষণ ও হিংসা-দ্বেষ দূরীভূত হয়ে যায় এবং পরস্পরে আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে।

পশ্চিমা সংস্কৃতি যেহেতু ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুখবাদী দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেছে, সেজন্যে এরই ফলে বিশ্বের ব্যক্তি ও জাতিগুলোর মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দু-সংগ্রাম, হিংসাদ্বেষ, রক্তারক্তি ও কোন্দল-কোলাহল অনিবার্য হয়ে ওঠে। এরই কারণে চারদিকে চরম বিপর্যয় ও অশান্তি বিরাজমান থাকে-শাসক ও শাসিত, বিজয়ী ও বিজিতের বিভিন্ন শ্রেণী মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

ইসলামী সংস্কৃতিবান প্রতিটি ব্যক্তি অন্য মানুষের জন্যে বেঁচে থাকে। এ কারণে শ্রেণী-ভেদ নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি মানুষের জীবন-জীবিকা ও যাবতীয় প্রয়োজন আপনা থেকেই পূরণ হতে থাকে।

পশ্চিমা সংস্কৃতি বিজিত জাতিগুলোকে প্রকৃতি-জয়ের সব তত্ত্ব, তথ্য ও গোপন রহস্য থেকে সম্পূর্ণ গাফিল বানিয়ে রাখে-বঞ্চিত রাখে সব প্রাকৃতিক কল্যাণ, সম্পদ ও সম্পত্তি থেকে। এ সংস্কৃতি সব কিছুকে নিজেদের একচেটিয়া ভোগ-দখলে রেখে দেয় এবং বিজয়ী জাতির প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের মন-মগজে বদ্ধমূল করে দিতেই সচেষ্ট হয়।

ইসলাম কেবলই একটি ধর্ম নয়, বরং দ্বীন এবং পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত একজন মানুষের জীবানাচরণ, রীতি নীতি কেমন হওয় উচিত, স্বল্প পরিসরের এ জীবনকে কিভাবে পরিচালিত করলে একজন মানুষ ইহকালে সুখময় জিন্দেগী এবং পর কালে মুক্তি লাভ করতে পারে তার একটি নিঁখুত ভারসাম্য পূর্ণ বিধান দিয়েছে ইসলাম।

ইসলামে রয়েছে একটি স্বচ্ছ সুন্দর ও সুস্থ সংস্কৃতি। যার অন্যতম লক্ষ হচ্ছে মানুষের জীবনকে সুন্দর করা, সুখ শান্তিময় ও কল্যানময় করা। বর্তমানে এক শ্রেনীর নাম সর্বস্ব মুসলমান ইসলামের এই সুস্থ ও সুন্দর সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে পশ্চাত্যের অশ্লীল,অশালীন ও নগ্ন অসংস্কৃতিক পিছনে পড়েছে যা নিতান্তই মূর্খতাপ্রসূত বিবেক বিবর্জিত।কেননা ইসলামী সংস্কৃতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অপেক্ষা অনেক সমৃদ্ধ, উন্নত, শালীন,মার্জিত, ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলনা:

ক. পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাঃ ইসলামে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার প্রতি অনেক বেশী গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রতিদিন অন্তত পাঁচ বেলা প্রতিটি মুসলমানকে নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজে এমন কোন বিধান নেই। তেমনিভাবে স্বামী ও স্ত্রীর যৌন মিলনের পর গোসল করা ইসলামে ফরয, কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজে যৌনকর্মের পর গোসল করার কোন ধারনাই নাই। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিয়মিত উযু ও গোসল করা ইসলামী সংস্কৃতির অংশ। পক্ষান্তরে ইউরোপের সংস্কৃতিবান জাতি হিসেবে পরিচিত ফরাসিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন “চতুর্দশ লুই”। তিনি সর্বসাকুল্যে তিনবার গোসল করেছিলেন । দুবারের গোসলে তার কোন হাতই ছিল না। জন্ম ও মৃত্যুর পর জর্ডান নদীর পানি দিয়ে তাকে গোসল দেয়া হয়। আর তার জীবনের তৃতীয় গোসল ছিল প্রথম বিবাহ করার সময়। এ থেকে সহজে অনুমান করা যায়, পাশ্চাত্য সমাজ শারীরিক ভাবে কতটা অপরিচ্ছন্ন।

খ. দাঁত ও মুখ পরিস্কার করণঃ নিয়মিত মুখ পরিস্কার করার জন্য ইসলামে মিসওয়াক ব্যবহার ও কুলি করার বিধান রয়েছে। কেবল ঘুম থেকে উঠার পরই নয়, কমপক্ষে দিনে পাঁচ বার নামাযের পূর্বে মিসওয়া করা সুন্নাত। যা দাঁত ও মুখকে পরিস্কার রাখে, এবং মুখের দুর্গন্ধকে দূর করে এবং দাঁতকে ভালো রাখে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সমাজে দেখা যায় যে, সকাল বেলায় বহু নারী পুরুষ নিয়মিত দাঁত মাজে না, খিলাল করে না। শুধু জীবানু নাশক তরল পদার্থ দিয়ে কুলি করে নেয়। এতে মুখের দূর্গন্ধ তো দূর হয়ই না, বরং এতে দাঁতেরও ক্ষতি হয়।

গ. পোশাক পরিচ্ছদঃ মুসলিম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা, টাখনুর উপরে কাপড় পরিধান করা এবং মহিলার ক্ষেত্রে পর পুরুষের সামনে সমস্ত শরীর ও নীচে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পোশাকে ঢেকে রাখা ফরজ, আবশ্যক। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজে দেখা যায় সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। পুরুষরা পোশাকে প্রায় পুরো শরীর ঢেকে রাখে এবং টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করে, আবার কখনো দেখা যায় হাঁটুর উপরে কাপড় পরিধান করে। আর মহিলারা অর্ধনগ্ন হয়ে চলাফেরা করে। ফলে যুব সমাজ ধর্ষন, ব্যাভিচার, এসিড নিক্ষেপ, নারী অপহরণ, প্রভৃতি অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

ঘ. বয়োবৃদ্ধ পিতা মাতা ও শশুর শাশুড়ীর প্রতি আচরণঃ ইসলাম মাতা পিতার আদেশ মান্য করা ও তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করাকে অপরিহার্য করেছে। বিশেষত তারা যখন বৃদ্ধ বয়সে উপনিত হন, তখন তাদের সামনে মন্দ ব্যবহার এমনকি বিরক্তি ভরে ‘উফ’ শব্দটি উচ্চারন না করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সমাজে সবচেয়ে হতভাগ্য ও অবহেলিত মানুষ হলো বয়োবৃদ্ধ পিতামাতা ও শশুর শাশুড়ী। সেখানে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে মেয়েরা পিতা মাতার সংসারে থাকে না, অথবা পিতা মাতাকে ছেলে মেয়েদের সংসারে রাখা হয় না। তারা পৃথক জীবন যাপন করে। চলন শক্তি রহিত না হওয়া পর্যন্ত তারা হাট বাজার করে। জীবন শক্তি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজেদের রান্না নিজেরাই করে। আর রান্না বা চলাফেরার শক্তি যখন না থাকে তখন রান্নার প্রয়োজন হয় না, এমন জিনিস খেয়ে বেঁচে থাকে। অনেক সময় একলা ঘরের মধ্যে

মরে পড়ে থাকে। দূর্গন্ধ বের হলে প্রতিবেশী ফ্লাটের লোকেরা দরজা ভেঙে মৃতদেহ বের করে। আর যারা তাদের বয়ো বৃদ্ধ মাতা পিতাকে আরেকটু ভালো রাখতে চায়, তারা তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে বা বৃদ্ধনিবাসে পাঠায়। বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতি এমন অমানবিক নিষ্ঠুরতাই চলে পাশ্চাত্য সমাজে। তেমনি ভাবে আমেরিকান মূল্যবোধে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বর্জনীয় বস্তু হলো শাশুড়ী। যাকে প্রথম সুযোগেই দূরে ফেলে দিতে হবে। তা না হলে তিনি পারিবারিক পরিবেশ দূষনীয় করবেন। তাই তারা ময়লা আবর্জনাকে তুলনা করে থাকে শাশুড়ীর সাথে। অথচ ইসলামে শশুর-শাশুড়ীর সাথে উত্তম ও ইহসানের সাথে আচরণ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

ঙ. শিশুদের প্রতি আচরণঃ ইসলামে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক অবৈধ, তাই বিবাহ বহির্ভূত সন্তানের জন্মের প্রশ্ন এখানে নেই এবং বিবাহিত দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদের হার খুবই কম বিধায় শিশুরা মাতা পিতার যৌথ ভালবাসায় বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়। অধিকন্তু মহিলারা সন্তানদেরকে অনেক বেশী সময় দিতে পারেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ও সন্তান নেয়ার ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ না থাকায় এবং বিবাহিত দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদের হার খুব বেশী হওয়ায় মাতা পিতার ভালোবাসা খুব কম সন্তানের ভাগ্যেই জোটে। তাছাড়া পাশ্চাত্য বাসীরা নিজ শিশুদেরকে কোলে নেয়ার চেয়ে পোষা কুকুরকে কোলে নিতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। এভাবে শিশুরা অনাদারে অবহেলায় বেড়ে ওঠে। আবার পিতা মাতা বাইরে বেড়াতে যাওয়ার সময় সাথে নেয় ছোট শিশু এবং পোষা কুকুর। কুকুরের গলার বেল্টের সঙ্গে লাগানো চেইন ধরে মা হেটে চলেছেন তো বাবা হাঁটেন শিশুর কোমরে বেল্টের সঙ্গে লাগানো শিকল ধরে। যেন মানব শিশু আর কুকুর সমস্তরের জীব। মানবতার প্রতি এ কেমন লাঞ্ছনা? শুধু তাই নয় ছোট অবুঝ শিশুর সামনে খেলনা আর খাবার রেখে একটি লম্বা বেল্ট বা চেইন দিয়ে ঘরে বেধে মা শিশুর সামনেই পরপুরুষ কিংবা বহুপুরুষের সাথে সম্পর্কে জড়ান অথবা অন্য কোন ধান্দায় ঘর থেকে বেরিয়ে যান। বাবা মা একসঙ্গে থাকলে দুজনই বাইরে চলে যান। এদিকে কিছুক্ষন খেলাধুলা করে অনেকক্ষন কেঁদে শিশুটি এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। যে শিশুর প্রতি বাবা মা এমন নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারেন, সে শিশুই বড় হয়ে বৃদ্ধ মা

বাবাকে নিজের কাছে রেখে সেবা যত্ন করার পরিবর্তে দূরে বৃদ্ধাশ্রমে ফেলে রাখে যেন তাদের সেই বাল্যকালেরই প্রতিশোধ নেয়।

চ. ছেলে মেয়ের ভরন পোষনঃ সাধারনত মুসলিম পরিবারের সন্তানরা পড়াশোনা শেষ করে কোনো পেশা বা কাজে নিয়োজিত না হওয়া পর্যন্ত পিতা মাতা ভরন পোষন দিয়ে থাকেন। আর মৃত্যুকালে অধিকাংশ সম্পদই উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানসন্ততির জন্য রেখে যান। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজে সন্তান বড় হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদেরকেই নিজেদের পড়াশোনার খরচ উপার্জন করতে হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মেয়েরা তাদের শিক্ষাব্যয়ের প্রায় অনেক টুকুই খন্ডকালীন যৌনকর্মী হিসেবে অর্জন করে থাকে। ছাত্রীদের বিপুল যৌন আয় লক্ষ করে ইদানিং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও এ পেশায় প্রতিযোগিতামূলক ভাবে এগিয়ে এসেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাদের চাহিদা ছাত্রীদের চেয়েও বেশী। অপরদিকে পাশ্চাত্যের ৯০ ভাগ লোকই মৃত্যুর পূর্বে নিজ সম্পদের ৮০-৯০ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ইত্যাদির জন্য উৎসর্গ করে যান। তারপর কদাচিৎ সামান্য অংশই পরবর্তী বংশধরদের জন্য রেখে যান।

ছ. বিয়ে ও যৌন চর্চাঃ একমাত্র বিবাহই ইসলামে নারী পুরুষের যৌন সম্ভোগ ও সন্তান লাভের বৈধ মাধ্যম। ইসলামে বিবাহ বহির্ভূত সকল প্রকার যৌনতা যেমনÑ লিভ টুগেদার, সমকামিতা, পুশু মৈথুন ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও মহাপাপ। শুধু তাই নয়, বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ যৌনতা রোধের পদক্ষেপ হিসেবে ইসলাম বেগাননারী পুরুষের মাঝে পর্দার বিধানকে ফরজ ও আবশ্যকীয় করেছেন। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, যৌনতার আবর্তেই পাশ্চাত্য সমাজ ঘুরপাক খাচ্ছে। ইতোমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বহু খৃষ্টান দেশে অবাধ যৌনতার যে ভীতিকর চিত্র ভেসে উঠেছে, তা যে কোন শান্তি প্রিয় মানুষকে সন্দেহাতীতভাবে ভাবিয়ে তোলে। পুরুষ সমকামিতা, নারী সমকামিতা, অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিতা মেয়ের যৌন সম্পর্ক, বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা মেয়ের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলার একত্রে বসবাস প্রভৃতি আজ মার্কিন মুল্লুক, যুক্তরাজ্য, কানাডাসহ বহুদেশে অপরাধ বলে বিবেচিত নয়। এছাড়া পশুমৈথুনের মত জঘন্য যৌনতার চর্চাও আজ পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে অবারিত।

এভাবে পিতৃ পরিচয়হীন অবৈধ জারয সন্তানে ভরে উঠেছে পাশ্চাত্য দেশগুলো । সেখানে বিবাহ ও পরিবার প্রথা দিন দিন লোপ পাচ্ছে।

১৯৭১ সালের হিসেব অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে বিবাহ বিচ্ছেদের হার শতকরা ৬৩ ভাগ। বর্তমান অবস্থা এ থেকে সহজে অনুমান করা যায়। পাশ্চাত্যের নারীরা বিভিন্ন অন্যায় ও অশ্লীল কর্মের মাধ্যমে ব্যয়ের একাংশ সংগ্রহ করে থাকে। একদিকে স্ত্রীরা অপকর্ম করে সংসারের আয় বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে স্বামীরা অবৈধ যৌনাচার করে প্রচুর অর্থ নষ্ট করে। পাশ্চাত্যে বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতর সয়লাব চারদিকে । উপরিউক্ত তুলনামূলক আলোচনা থেকে সুস্পষ্টরুপে প্রতীয়মান হয় যে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি থেকে ইসলামী সংস্কৃতি সবদিক দিয়ে অতুলনীয় উন্নত, শালীন, মার্জিত, মঙ্গলজনক, ও কল্যানময়। এছাড়া আহার, নিদ্রা, শৃঙ্খলা, পারস্পারিক সম্পর্ক, বিবেচনাবোধ, উৎসব,অনুষ্ঠান, প্রভৃতি মানব জীবনের প্রয়েজনীয় সকল সাংস্কৃতিক উপাদান ও উপকরণের ক্ষেত্রে ইসলামে রয়েছে স্বচ্ছ, সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ বিধান। যা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে অনুপস্থিত। তাই দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায়, অনাবিল সুখ, শান্তি কল্যানময় জীবন যাপনের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান ও সংস্কৃতির কোন বিকল্প পৃথিবীর বুকে নেই।

সংস্কৃতি ও নৈতিকতা

ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। সাধারণভাবেও নৈতিকতার এই গুরুত্ব সর্বকালে ও সর্ব সমাজে স্বীকৃত। সুদূর অতীত কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সকল চিন্তাবিদ ও দার্শনিকই নৈতিকতার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর দুনিয়ার তাবৎ ধর্মসমূহের ভিত্তিই রচিত হয়েছে এই নৈতিকতার ওপর এবং সে কারণে প্রত্যেক ধর্মই তার অনুসারীদের জন্যে অলংঘনীয় নৈতিক নিয়ম-বিধান পেশ করেছে। কেননা ধর্মের দৃষ্টিতে মানবজীবনের সাফল্য এই নৈতিকতার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। উপরন্তু দুনিয়ার শান্তি, স্বস্তি, সুখ ও সাচ্ছন্দ্য, প্রগতি ইত্যাদি নির্বিঘ্নতা, নিরাপত্তা ও নৈতিকতা ছাড়া আদৌ সম্ভবপর নয়। এটা অস্বীকার করার সাধ্য

কারোর নেই। যে ব্যক্তি বা জাতি উত্তম ও নির্মল চরিত্রগুণে গুণান্বিত সে-ই সর্বপ্রকার কল্যাণ ও খোদায়ী রহমত ও বরকত লাভের অধিকারী। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বা জাতি তা থেকে বঞ্চিত তার পক্ষে কল্যাণ লাভ তো দূরের কথা, কালের ঘাত-প্রতিঘাতে টিকে থাকাই অসম্ভব; কেননা সামাজিক ও তামাদ্দুনিক শৃংখলা কেবলমাত্র উত্তম নৈতিকতার দরুনই সংরক্ষিত হতে পারে আর তা না থাকলে সে শৃংখলা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়ে গোটা সমাজের উচ্ছৃংখলতা ও অরাজকতার অতল গহ্বরে নিপতিত হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। সমাজতত্ত্ববিদ ও ইতিহাস-দার্শনিক আল্লামা ইবনে খালদুনের দৃষ্টিতে জাতিসমূহের উত্থান ও পতনের মূলে নিহিত আসল নিয়ামক হচ্ছে এই নৈতিকতা। তিনি লিখেছেন:

'আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতি, বংশ-গোষ্ঠী বা দলকে দেশ-নেতৃত্ব ও রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব দিয়ে মহিমান্বিত করতে চান, তখন সর্বপ্রথম তার নৈতিক অবস্থার সংশোধন করে নেন আর তারপরই এই মর্যাদা তাকে দান করেন। অনুরূপভাবে কোন জাতি, গোষ্ঠী বা দলের হাত থেকে এই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব যদি কেড়ে নেবার সিদ্ধান্ত করেন, তাহলে পূর্বেই তাকে চরিত্রহীনতা ও দুরাচারে উদ্বুদ্ধ করে দেন। তার মধ্যে এনে দেন সব রকমের দুষ্কৃতি, অশ্লীলতা ও উচ্ছৃংখলতা আর অন্যায় ও খারাপের পথে তাকে বানিয়ে দেন দ্রুত অগ্রসরমান। এরই ফলে সে নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রশাসনিক যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তার শাসন-দণ্ড শক্তিহীন হয়ে ক্রমশ তার হস্তচ্যুত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আসল শাসন ক্ষমতাই তার হাত থেকে চলে যায় আর তার স্থানে অন্যরা ক্ষমতাসীন হয়ে বসে (মুকাদ্দমা)।

দুনিয়ার প্রতিটি ব্যক্তিই তার জীবনে সাফল্য লাভের অভিলাষী। এই অভিলাষ কেবল মাত্র দুটি জিনিসের সাহায্যেই সাফল্যমন্ডিত হতে পারে। একটি হল আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান আর দ্বিতীয়টি হল সদাচার ও শুভ কর্ম। অন্যকথায়, জীবন ও জগত সংক্রান্ত মৌলনীতি ও বিশ্বাসসমূহের প্রতি অবিচল প্রত্যয়েরই অপর নাম ঈমান আর তদনুযায়ী বাস্তব কাজই হল শুভ কর্ম, সদাচার বা নেক আমল। জীবনের সাফল্যের জন্যে এ দুটির সমন্বয় অপরিহার্য। ইসলাম মানুষের মুক্তি এ দুটি জিনিসের ওপর ভিত্তিশীল করে

দিয়ে এ তত্ত্বেরই বাস্তবায়ন চেয়েছে। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে এ দুটি অবিচ্ছেদ্য – ওতপ্রোত জড়িত। তবে ঈমান হল ভিত্তি আর নেক আমল হল তার ওপর গড়ে ওঠা প্রাসাদ। ঈমান হল বীজ আর নেক আমল হল সেই বীজ থেকে অঙ্কুরিত বিরাট মহীরুহ। 'নেক আমল' এক বিরাট ও বিশাল তাৎপর্যমণ্ডিত বিশেষ পরিভাষা। মানব জীবনের সব রকমের কাজই এর অন্তর্ভুক্ত। তা সত্ত্বেও একে দুটি ভাগে বিভক্ত করা চলে। একটি ভাগের সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে আর অপর ভাগটির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হচ্ছে মানুষ তথা সৃষ্টিকুলের সঙ্গে। প্রথমটির প্রচলিত নাম 'ইবাদত' আর দ্বিতীয়টিকে বলা যায় 'মুআমিলাত'। দ্বিতীয়টিকেও দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। তার কতকগুলো হচ্ছে মানবীয় কর্তব্য বিশেষ, যাকে বলা হয় আখলাক বা নৈতিকতা আর অন্যগুলো আইনগত দায়িত্ব পর্যায়ের। সাধারণত একেই বলা হয় মু'আমিলাত।

এই ইবাদাত ও নৈতিকতার সমন্বয়েই ইসলামী জীবন বিধান গঠিত। এ দুটি বিষয় ইসলামী জীবন বিধানের দুটি বাহু বিশেষ। তাই এর কোনটিরই গুরুত্বকে কোনোভাবেই হালকা করে দেখা যেতে পারে না। নিছক ইবাদত মানুষকে পূর্ণ মুসলমান বানাতে পারে না যেমন, তেমনি এককভাবে শুধু নৈতিকতাও তা সম্পাদন করতে অক্ষম। কুরআন মজীদ এ সত্যকে যথার্থ মর্যাদা দিয়েছে। তাতে যেখানেই ইবাদতের কথা বলা হয়েছে, সেখানেই বলা হয়েছে সৎকর্ম ও সদাচার তথা নৈতিকতা অবলম্বনের কথা-বলা হয়েছে সমান গুরুত্ব সহকারে।

চরিত্র ও ঈমান

মুসলমান হওয়ার প্রথম ও মৌল শর্ত হল ঈমান। কিন্তু ঈমান মন-মানস ও হৃদয়-মনের একটা বিশেষ অবস্থা ও ভাবধারা এবং প্রচ্ছন্ন অন্তর্নিহিত ব্যাপার। আল্লাহ্ ছাড়া তার অস্তিত্ব ও অবস্থা সম্পর্কে কেউই অবহিত হতে পারেনা। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা সৎ ও নিষ্কলংক চরিত্রকে মুমিনের ঈমানের মানদণ্ড রূপে নির্ধারণ করেছেন। ইমাম গাজ্জালীর মতে ইসলামে ঈমানের সাথে চরিত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও নিবিড়।

মানব-মনে হীন, নীচ ও অসৎ ভাবধারা লালিত-পালিত হয় বিধায় তার ক্ষতি ও অনিষ্টকারিতা প্রবৃদ্ধি লাভ করে। ফলে এমন একটা অবস্থা দেখা দেয়, যখন মানুষ দ্বীনকেই পরিত্যাগ করে বসে। তখন সে কার্যত নিজেকে লোকদের মানসে উলঙ্গ করে দেয়। এরূপ অবস্থায় তার ঈমানের দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হয়। সূরা 'আল-মুমিনূন'-এ ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রকে ঈমানদার লোকদের জরুরী গুণপনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ দুটির ওপরই মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

"এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, সেসব মুমিনরাই প্রকৃত সাফল্য লাভ করেছে যারা নিজেদের নামাযে ভীত-সন্ত্রস্ত অন্তরে দণ্ডায়মান হয়, যারা অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে, যারা নিরন্তর নিজেদের পবিত্র ও পরিচ্ছন্নকরণ প্রচেষ্টায় নিরত থাকে, যারা নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহকে (হারাম ব্যবহার থেকে) রক্ষা করে, যারা তাদের আমানতসমূহ ও ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি সংরক্ষণ করে আর যারা নিজেদের সালাতসমূহকে সংরক্ষণ করতে থাকে...।" – (সূরা মুমিনূন: ১ থেকে ৯)

স্বয়ং নবী করীম (স) বহু সংখ্যক হাদীসে বহু সংখ্যক গুণ-বৈশিষ্ট্যকে ঈমানদার লোকদের অপরিহার্য বিশেষত্ব রূপে গণ্য করেছেন। সেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যে যতটা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে, ঈমানের অবস্থায়ও সেই অনুপাতে তারতম্য ঘটবে। তার অর্থ এই যে, আমাদের বাহ্যিক চরিত্র ও আচার-আচরণ আমাদের অন্তর্নিহিত ঈমানী অবস্থার মাপকাঠি বা পরিমাপ যন্ত্র। কোন লোকের ঈমানী অবস্থা বাস্তবিকপক্ষে কি তা এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়। নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন:

১. ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তার একটি হচ্ছে লজ্জা।

২. ঈমানের বহু সংখ্যক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাওহীদের ঘোষণা আর সবচাইতে কম গরুত্বপূর্ণ হচ্ছে লোকচলাচলের পথ থেকে পীড়াদায়ক জিনিসের অপসারণ।

৩. তিনটি কথা ঈমানের অংশ। দরিদ্রাবস্থায়ও আল্লাহর পথে ব্যয় করা, দুনিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তার প্রসারতা বিধান এবং স্বয়ং নিজের বিরুদ্ধেও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।

৪. মুসলমান সে, যার হাত ও মুখ থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকবে আর মুমিন সে যার ওপর এতটা বিশ্বাস ও আস্থা হবে যে তার নিকট নিজের জান ও মালও আমানত রূপে অক্ষুণ্ণ থাকবে।

৫. মুমিন সে, যে অন্যকে ভালবাসে। যে লোক অন্যকে ভালবাসেনা এবং তাকেও কেউ ভালবাসে না তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

৬. মুমিন কারোর ওপর অভিশম্পাত করেনা, কাউকে বদদো'আ দেয় না, কাউকে গালাগাল করেনা এবং কারোর সাথে মুখ খারাপও করেনা।

৭. মুমিন সে, যাকে লোকেরা বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসভাজন মনে করবে। মুসলিম সে যার মুখ ও হাত থেকে লোকেরা নিরাপদ থাকবে।

৮. তিনটি জিনিস দ্বারাই বেঈমান ও মুনাফিকের পরিচিতি পাওয়া যায়। তা হলো, যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করবে এবং তার কাছে আমানত রাখা হলে সে তা বিনষ্ট করবে।

৯. নিকৃষ্টতম ব্যক্তি সে যাকে লোকেরা তার খারাপ মুখের দরুন পরিত্যাগ করেছে।

১০. মানুষকে যা কিছুই দেয়া হয়েছে, তাতে উত্তম জিনিস হল সৎ বা উত্তম চরিত্র।

১১. ইসলামে অশ্লীল কথাবার্তা বলার কোনো স্থান নেই। উত্তম মুসলমান সে, যে চরিত্রের দিক দিয়ে অতীব উচ্চ মর্যাদাবান।

চরিত্র ও আল্লাহর ভালোবাসা

ভালবাসা মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার একটি মূল্যবান অবদান। বিশেষ করে আল্লাহর ভালবাসা একটি অতি বড় সম্পদ, তাতে সন্দেহ নেই। এই মহামূল্যবান সম্পদ অর্জনের উপায় আমাদের জেনে রাখা অতীব জরুরি।

যে সব উপায়ে এই মহামূল্য সম্পদ লাভ করা যেতে পারে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল উত্তম চরিত্র। আর যেসব কারণে এই মহামূল্যবান সম্পদ অপহৃত হয় তন্মধ্যে চরিত্রহীনতা ও অসদাচরণ অন্যতম।

• কুরআনের দৃষ্টিতে নিম্নে উল্লিখিত নৈতিক গুণাবলীর মাধ্যমে আল্লাহর ভালবাসা অর্জিত হতে পারে:

১. দয়া ও অনুগ্রহ।

২. সুবিচার ও ন্যায়পরতা

৩. নৈতিক ও দৈহিক পবিত্রতা বা নিষ্কলুষতা

• যে বিষয়গুলো আল্লাহর ভালবাসা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে তা হলোঃ

১. আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন

২. বিশ্বাসঘাতকতা ও আমানতে খিয়ানত করা

৩. বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করা

৪. উচ্ছৃংখলতা, অপব্যয় ও বাড়াবাড়ি করা

৫. অহংকার ও আত্মম্ভরিতা

আল্লাহর গুণাবলী ও চরিত্র

বস্তুত ইসলাম উত্তম ও শুভ চরিত্রের একটি অতীব উন্নত মান ও চিন্তা-চেতনা উপস্থাপন করেছে আর তাহল উত্তম শুভ চরিত্র। এটি মূলত খোদায়ী গুণাবলীর ছায়া এবং তারই সামান্য প্রতিফলন মাত্র। রাসূলে করীম (স) বলেছেন:

উত্তম চরিত্র আসলে আল্লাহ তা'আলার মহান ও সুউচ্চ চরিত্রেরই প্রতিফলন মাত্র।

আমাদের দৃষ্টিতে উত্তম চরিত্র তা-ই যা আল্লাহর মহান গুণাবলীর প্রতিবিম্ব আর খারাপ চরিত্র বলতে আমরা বুঝি সেই সবকে, যা আল্লাহর গুণাবলীর পরিপন্থী। ইসলাম মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভের উপায় রূপে নির্দিষ্ট করেছে চরিত্রকে। তার কারণ হল, চরিত্র খোদায়ী গুণাবলীর জ্যোতিমালা থেকে গৃহীত ও নিঃসৃত। এই গ্রহণ ও অর্জনে আমরা যতটা অগ্রগতি লাভ করব, আমাদের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ততই বেশী নিশ্চিত হবে এবং তার ধারাবাহিকতা থাকবে অবধারিত।

চরিত্র ও ইবাদাত

ইসলামী আদর্শে গুরুত্বের দিক দিয়ে চরিত্রের স্থান যদিও তৃতীয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিবেচনা করলে জানতে পারা যাবে যে, ইবাদতসমূহ মূলত মানুষকে আদর্শ চরিত্রবান বানাবারই উপায় মাত্র। মানুষ সত্যনিষ্ঠ, সততাবাদী ও নিষ্কলুষ চরিত্রগুণের অধিকারী হয়ে গড়ে উঠুক, এক মহান নৈতিক গুণাবলী আয়ত্ত ও আত্মস্থ করে মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের যোগ্যতা অর্জন করুক, সেই সঙ্গে নিজের অধিকার ও কর্তব্য যথাযথভাবে আঞ্জাম দিক-ইবাদতসমূহের এই তো পরম ও চরম উদ্দেশ্য আর এরই অপর নাম হল চরিত্র।

বস্তুত মানব-মনের নৈতিক প্রশিক্ষণের একটা কার্যকর মাধ্যম রূপেই ইবাদতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এরই সহায়তায় মানুষ নিজের হৃদয়াবেগ ও কামনা-বাসনা সংযত করতে সক্ষম হতে পারে।

আল্লাহকে স্মরণ করা ও তাঁর সামনে মস্তক অবনত করার অর্থ হচ্ছে, আমরা একটি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে মন-মানস ও কামনা-বাসনার স্বাধীনতাকে ত্যাগ করেছি। ইবাদতের সময় এই অনুভূতি না জাগলে এবং নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন, বিমুক্ত ও স্বেচ্ছাচারী মনে করলে ইবাদতের কোনো সুভফল অর্জিত হতে পারে না। কেননা ইবাদতের মর্মই হল, মহান আল্লাহই আমাদের একমাত্র মা'বুদ এবং আমরা একান্তভাবে তাঁরই দাসানুদাস। তাই তাঁর মুকাবিলায় আমাদের স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই-কিছু থাকতে পারে না। আমাদের কামনা-বাসনা, আশা-আকাংক্ষা ও প্রয়োজনাবলী আমাদের ধর্মীয় ও নৈতিক লক্ষ্যানুগ ও তারই অধীন। কুরআনের একটি আয়াতে নামায তরক করা ও লালসা-বাসনার অনুসরণ করার কথা এক সঙ্গে উল্লেখ করে একথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কামনা-বাসনা-লালসার আনুগত্য ও অনুসরণ সম্ভব ও সহজ হয়ে ওঠে ইবাদত ত্যাগ করলে। ইবাদত যথাযথ পালন করা হলে তা হতে পারে না।

সাধারণত লোকদের ধারণা হল, ঈমানের পরই নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ এই চারটি স্তম্ভের ওপরই ইসলামের সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মিত। নৈতিক চরিত্রের কোনো গুরুত্ব এতে আছে বলে মনে করা হয় না। অথচ আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নৈতিক চরিত্রের গুরুত্বকে কিছুমাত্র উপেক্ষা করেন নি। তাই যেখানেই কোনো ইবাদত ফরয হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানেই স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, মানুষের উত্তম ও উন্নত চরিত্র গড়ে তোলা ও তার পূর্ণত্ব বিধানই মানুষের চরমতম লক্ষ্য। নামায ফরয হওয়া প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তা মানুষকে সর্বপ্রকার অন্যায়, পাপাচার ও নির্লজ্জতা থেকে বিরত রাখে। রোযা ফরয করেই বলে দেয়া হয়েছে, তা মানুষের মধ্যে তাকওয়া বা খোদাভীতির সৃষ্টি করে। যাকাত বিত্তবানদেরকে মহানুভবতা ও সহৃদয়তার শিক্ষা দেয় এবং হজ্জও বিভিন্নভাবে মানুষের নৈতিক সংশোধন ও উৎকর্ষ বিধানের কাজ করে বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

নামায সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন: যার নামায তাকে অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে না, তার নামায তাকে আল্লাহর নিকট থেকে আরও দূরে নিয়ে যায়।

রোযা সম্পর্কে একটি হাদীসে বলা হয়েছে: রোযা রেখেও যে লোক মিথ্যা ও প্রতারণা পরিহার করেনি, নিজের পানাহার সে বন্ধ রাখুক-তাতে আল্লাহর কোন প্রয়োজনই নেই।

একটি হাদীসের কথা হল, মুমিন তার উত্তম ও সৎ চরিত্রের বলে (নফল) রোযাদার ও (নফল) নামাযীর মর্যাদা লাভ করতে পারে।

যাকাত ও হজ্জ ফরয হওয়ার বিষয় বিবেচনা করলে বুঝতে পারা যাবে যে, নিজের বংশ ও পরিবার-পরিজনের মৌল অধিকার যথাযথ আদায় না হওয়া পর্যন্ত কারোর ওপর তা ফরযই হয় না। অন্য কথায়, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাহর ওপর নিজের অধিকার ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজিব করেন না, যতক্ষণ সে বান্দাহদের অধিকারসমূহ আদায় না করছে।

আল্লাহর হক্ক ও বান্দাহর হক্ক

ইবাদত ও চরিত্রকে যথাক্রমে আল্লাহর হক্ক ও বান্দাহর হকু বলে চিহ্নিত করা যায়। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ, লেনদেন ও আদান-প্রদানেরই অপর নাম চরিত্র। আর ইবাদত হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ফরয রূপে ধার্য কর্তব্য। একটু গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে বুঝতে পারা যাবে যে, চরিত্রের গুরুত্ব ইবাদতের তুলনায়ও অনেক বেশী। শিরক ও কুফর একান্তভাবে আল্লাহর অধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপার। এ ছাড়া আল্লাহর অধিকারের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য গুনাহ ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু মানুষের অধিকার অনাদায় থাকলে তা ক্ষমার অযোগ্য। আল্লাহ নিজে তা ক্ষমা করে দেবেন না; তা ক্ষমা করার অধিকার ঠিক সেই মানুষের হাতেই রাখা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর নিকট থেকে যে দয়া-অনুগ্রহ পাওয়ার আশা করা যায়, তাতো আর মানুষের কাছ থেকে পাওয়ার আশা করা যায় না। তাই নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির ওপর (যে তার ভাই) জুলুম করেছে সেই জালিম (ভাই)-র কর্তব্য হল, এই দুনিয়ায়ই সেই মজলুম ভাইর নিকট থেকে জুলুমের ক্ষমা চেয়ে নেয়া। অন্যথায় কিয়ামতে তার ক্ষতিপূরণ করার জন্যে কারোর নিকট কোনো টাকা-পয়সা (দিরহাম ও

দীনার) থাকবে না-থাকবে শুধু আমল। জালিমের নেক আমলসমূহ মজলুম পেয়ে যাবে। নেক আমল না থাকলে মজলুমের পাপসমূহ জালিমের আমল-নামায় লিখে দেয়া হবে।

নৈতিক চরিত্র ও আইন

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের মধ্যেই তাকে বাস করতে হয়। সমাজ ছাড়া মানুষের জীবন অচল। বহু সংখ্যক মানুষ যখন একত্রে জীবন যাপন করে তখন তাদের মধ্যে কোনো-না-কোনো বিষয়ে মত-বৈষম্য, কলহ ও বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এই সমাজে একজনের অধিকার অপরজন কর্তৃক অপহৃত হওয়ার ঘটনা মোটেই বিরল নয়। শক্তিশালী এখানে দুর্বলের ওপর অন্যায় ও বাড়াবাড়ি করতে পারে বা তাকে পর্যুদস্ত করবার চেষ্টা করতে পারে। ধনী গরীবের ওপর অন্যায় আচরণ ও শোষণ চালাতে পারে। এসব অপরাধ নির্মূল করার লক্ষ্যে যে আইন ও বিধান রচিত হয়েছে, তার একটা অংশ নৈতিক এবং তা অনুসরণ করা বা না-করা ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল; সেজন্য কাউকে জোরপূর্বক বাধ্য করা যেতে পারে না। অবশ্য এমন কিছু নিয়ম-বিধি রচিত হয়েছে, যা পালন করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্তব্য। এই নিয়ম-বিধিকেই পরিভাষায় বলা হয় আইন।

এই আইন ও নৈতিকতার মূল লক্ষ্য যদিও এক ও অভিন্ন; কিন্তু তা লাভ করার পথ ভিন্ন ভিন্ন। এককভাবে এর কোনটিই প্রয়োজন পূরণে সক্ষম নয়-সব ক'টি দিককে পরিব্যাপ্ত করতে পারে না। তাই এর একটির অসম্পূর্ণতা অন্যটির দ্বারা পূর্ণত্ব লাভ করে। আইন অন্যায় ও পাপ কাজকে বন্ধ করতে পারে বটে; কিন্তু মানব মনে তার প্রতি ঘৃণা জাগাতে পারে না। ফলে আইনের বাঁধন যখনই শিথিল হবে বা আইন রক্ষাকারীরা চোখের আড়াল হবে, তখনই পাপ ও অন্যায় সংঘটিত হবে; তখন তা ঠেকিয়ে রাখা আর সম্ভব হবে না। কিন্তু নৈতিক চরিত্রের সাহায্যে যে পাপ ও অন্যায় দূর হয়, তা স্থায়িত্ব লাভ করে। তার পুনরাবৃত্তি হয় না বললেই চলে। কেননা চরিত্র ও নৈতিকতা মানব মনে অন্যায় ও পাপের প্রতি একটা তীব্র ঘৃণা জাগিয়ে দেয়। অর্থাৎ

প্রথমটির পাহারাদারী কখনো সার্বক্ষণিক হতে পারে না। সার্বক্ষণিক পাহারাদারী হতে পারে দ্বিতীয়টির; কেননা তা মানুষের অভ্যন্তরে অবস্থিত। সুতরাং তা-ই হতে পারে মানুষের দ্বীন ও ঈমানের অতন্দ্র প্রহরী, প্রতিরোধকারী। উপরন্তু আইন শুধু মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ ও জীবন ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের মন-মানস ও চিন্তা-বিশ্বাসের মর্মমূলে তার কোনো ছায়াপাত ঘটেনা। কিন্তু চারিত্রিক প্রতিরোধের অবস্থান মানুষের অন্তরে। মানুষের মন-মানস ও হৃদয়-বৃত্তির সাথে তার গভীর ও ঘনিষ্ট সম্পর্ক; বরং তার উৎসই হচ্ছে এই মান-মানস ও হৃদয়-বৃত্তি। তাই মানুষের হৃদয়-মন যতক্ষণ জাগ্রত ও সচেতন থাকে ততক্ষণ তার দ্বারা পাপ ও অন্যায় কাজ সম্ভব হতে পারে না।

একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়, আইনের তুলনায় নৈতিকতাই অধিক গুরুত্বের অধিকারী। চরিত্র আসলে আইনেরই সংরক্ষক; বরং একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, আইনের ভিত্তিই হচ্ছে চরিত্র। একটি জাতির ও একটি সমাজের নৈতিক অবস্থারই দর্পন হচ্ছে আইন। যে জাতির চরিত্র উত্তম, তার আইন-কানুনও নমনীয়।

আর জাতির চরিত্র যদি হয় খারাপ, তাহলে তার জন্যে কঠোর আইন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। জনগণ যদি নিজেই নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তৎপর হয়, তাহলে রাষ্ট্র-সরকারকে কঠোর ও উৎপীড়ক আইন রচনা করতে কখনো বাধ্য হতে হবে না।

ইসলাম মানব প্রকৃতি ও মানবীয় মনস্তত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে চরিত্র ও আইন উভয়কেই প্রয়োগ করেছে। যে সব অন্যায় ও পাপের প্রতিক্রিয়া অন্যদের প্রভাবিত করে কিংবা বলা যায়, যে সব অন্যায় ও পাপ সমগ্র সমাজ ও জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট তাকে আইনের অধীন নিয়ে নেয়া হয়েছে। হত্যা, চুরি, ডাকাতি ও অন্যায় কাজের দোষারোপ প্রভৃতি এই পর্যায়ে গণ্য। আর যে সব বিষয় ও ব্যাপার ব্যক্তির আত্মার সাথে সম্পর্কিত- যেমন মিথ্যা না বলা, দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন, গরীবদের সাহায্য প্রভৃতি-এগুলোকে নৈতিক চরিত্রের ব্যাপার বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে আমরা অতি সহজেই বলতে পারি যে, দ্বীন-ইসলাম তথ্য হযরত মুহাম্মাদ (স) প্রবর্তিত শরী’আত হচ্ছে আইন ও নৈতিক চরিত্রের সমন্বয়।

ইসলাম নৈতিকতাকে প্রতিটি ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়েছে- যদিও তার একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বও রয়েছে- আর আইনকে অর্পণ করেছে সমাজ ও রাষ্ট্রের হাতে। আইনের ভিত্তির ওপর সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। তাকে সরিয়ে দিলে রাষ্ট্র-সংস্থা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। তখন কারও জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু সংরক্ষিত থাকবেনা, বরং থাকার সম্ভাবনাই শেষ হয়ে যাবে। তাই সংস্কৃতির নামে চরিত্র বিনষ্টকারী কোনো অনুষ্ঠানকেই বরদাশত করা যেতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে সংস্কৃতি মানব চরিত্রকে উন্নত ও নির্মল করবে। পক্ষান্তরে যে সংস্কৃতিই মানব চরিত্রকে বরবাদ করে তা সংস্কৃতি নয়-দুষ্কৃতি মাত্র।

উপসংহার

পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সঠিক জ্ঞান অর্জন, জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করা, প্রয়োগ ক্ষমতা বাড়ানো, যোগ্যতার উন্নতি, দক্ষতা বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন উপাদান অর্জন করে পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতিকে সঠিক ভাবে মোকাবেলা করে ইসলামের মূল শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ তায়ালা তার রাসুল (সঃ)-এর মতাদর্শকে অনুসরণ করে ইহলৌকিক কল্যান ও পরকালীন মুক্তি অর্জন করা সম্ভব। মুসলিম সমাজকে সজাগ হতে হবে। প্রতিরোধ করার কৌশল রপ্ত করতে হবে। নচেত মুসলমানেরা ব্যর্থ জাতি হিসেবে ইতিহাসের গর্বে হারিয়ে যাওয়ার ভয় আছে। মুসলমানদের উচিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এই আন্দোলনের ভিত্তি হবে সাংস্কৃতিক সচেতনতা। মুসলিম রাষ্ট্র গুলোর সাংস্কৃতিক নীতিমালা প্রনয়ন করতে হবে। প্রয়োজনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং স্যাটেলাইট চ্যানেল নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা ও এই আইনে রাখতে হবে।নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত অশ্লীল বই পুস্তক পরিহার করে মূল্যবোধ ও আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষার প্রচলন করতে হবে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিপরীতে ইসলামি আদর্শভিত্তিক কাজ করা প্রয়োজন। পাশ্চাত্য মিডিয়ার অপপ্রচারে গোটা মুসলিম বিশ্ব তথ্য সন্ত্রাসে আক্রান্ত। মুসলমানদেরকে জঙ্গি, মৌলবাদ, উগ্রপন্থী হিসেবে বিশ্বের মানুষদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। সুতরাং মুসলমানদের উচিত নতুন

ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়া গড়ে তুলে এ সমস্ত বিষয়ের প্রতিবাদ জানানো এবং বিশ্বের সামনে এর বাস্তবতা তুলে ধরা।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে যে নৈতিক অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায় তা কল্পনাতীত। পাশ্চাত্যের পুরো অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে সুদ ও প্রতারণার উপর, যা আল্লাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার শামিল। সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে যৌনবিকৃতির নানা প্রক্রিয়া; সমকামিতা, উভকামিতা, অজাচার, পশুকামিতাসহ নানান যৌনবিকৃতি পাশ্চাত্যর স্বাধীনতার মূলনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্থিব উন্নতিই এখানে সফলতার একমাত্র মাপকাঠি। কওমে ফেরাউন, কওমে লুত, কওমে শুয়াইব, কওমে আদ, কওমে সামুদ, কওমে সাবা, রোমান সভ্যতাসহ ৫ হাজার বছরের ইতিহাসের প্রতিটি সভ্যতার পতন-ফ্যাক্টই বিদ্যমান আছে পাশ্চাত্যে। তারা এখন দাঁড়িয়ে আছে অধঃপতনের দ্বারপ্রান্তে। পাশ্চাত্য সমাজে সংহতি আর পারিবারিক বন্ধন বলতে কিছু আর নেই। নৈতিকতার চরম সংকটে জ্বলেপুড়ে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে তারা। সাম্রাজ্যের অর্থনীতি আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে নানা দিক থেকে। সাম্রাজ্যের গোরস্থানখ্যাত আফগান ভূমিতে আজ নতুনভাবে তাদের কবর রচনা হয়েছে। সাম্রাজ্যের অর্থনীতি, সমরশক্তি এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নতজানু হয়ে শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে খোরাসানের বাহিনীর সাথে, যে বাহিনীর হাত ধরে পৃথিবীজুড়ে আবার প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলাম ইনশাআল্লাহ।

পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে বহুমুখী ফিতনার সৃষ্টি হবে। ঈমানের উপর চতুর্মুখী আঘাত আসবে। ঘন কালো ফেতনা বর্ষণ হবে তাসবির দানার মতো। একজন সকালে মুমিন থাকলে বিকেলে কাফের হয়ে যাবে। বিকেলের মুমিন রাতে মুরতাদ হয়ে যাবে। -- *(মুসলিম - ২১৩)।* বস্তুবাদী দর্শনের কবলে পড়ে মানুষ ঈমান হারাতে থাকবে। যারা ফেতনার সময় ঈমানের উপর অটল থাকতে চাইবে, হাতে আগুনের অঙ্গার তুলে নেওয়ার মতো সাহসী মনোবল থাকতে হবে তাদের। তাদের মর্যাদা হবে আল্লাহর কাছে সাহাবিদের মতো। --(আহমাদ, ১৬৫২৮; বি.দ্র.: এখানে শেষযুগের ফেতনার সময়ে মুমিনদের বিশেষ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে, হুবহু সাহাবায়ে কেরাম বা শ্রেষ্ঠ তিনযুগের লোকদের মতো নয়। কেননা তাদের ফজিলত কুরআন ও হাদিসে এসেছে)।

তাই নিজেকে, মুসলিম জাতিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কবল থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের কঠিন পরীক্ষার পথ পাড়ি দিতে হবে। এই সফরে নিজেকে শামিল করতে হলে প্রথমেই নিজের ঈমান ও বিশ্বাসকে পাশ্চাত্যের আগ্রাসন থেকে মুক্ত করতে হবে। পাশ্চাত্যের যেকোনো চিন্তাভাবনার স্পর্শ থেকে ঈমানকে রাখতে হবে স্বচ্ছ। মুমিনের ঈমান হরণ না করে তারা ক্ষান্ত হবে না। নিজেদের দীন ও শরিয়তের আদি অবস্থান আঁকড়ে ধরতে পারার মাঝেই রয়েছে ঈমানের সুরক্ষা। পাশ্চাত্য সব আয়োজন ও আগ্রাসনের হতাশা আর ভয়কে কাটিয়ে যদি আমরা নিজেদের ঈমান স্বচ্ছ রাখতে পারি, তবেই ইসলামের বিজয়ের মিছিলে আমরা জায়গা করে নিতে পারব ইনশাআল্লাহ।

তথ্যসূত্র

১. ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (র).

২. শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি : মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

৩. ইসলামী সংস্কৃতি – আসাদ বিন হাফিজ

৪. হিউম্যান বিয়িং শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব – মাওলানা ইফতেখার সিফাত হাফিযাহুল্লাহ।

৫. https://imam.gov.bd/singlepost/5545

৬. https://ijosper.uk/index.php/i/article/download/9/9?shem=ssc

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111569522/